শ্রীঅরবিন্দ

কেনোপনিষদ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

[ইংরাজী 'Kena Upanishad'-এর অনুবাদ]

প্রকাশক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

অনুবাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত সেন

প্রথম সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

2/54/1000

সূচীপত্র

কেনোপনিষদ

মূল ও অনুবাদ

প্রথম খণ্ড

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথম ঃপ্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

১। কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিক্ষিপ্ত মন তার লক্ষ্যে পতিত হয়? কার দ্বারা যুগে বদ্ধ হয়ে প্রথম প্রাণ তার পথে এগিয়ে চলে? কার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে লোকে এই সব বাক্য বলে? কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে তাদের কাজে নিযুক্ত করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

২। শ্রোত্রের পশ্চাতে যা শ্রোত্র, মনের যা মন, বাক্যের পশ্চাতে যা বাক্, প্রাণবায়ুরও তাই প্রাণ, চক্ষুর পশ্চাতে চক্ষু।

ধীমান ব্যক্তিরা এই সব অতিক্রম করে মুক্তি অর্জন করেন এবং ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে অমর হন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩

৩। সেখানে চক্ষু উপনীত হয় না, বাক্যও যায় না, মনও নয়। জানি না, বুঝতেও পারি না যে, কি করে সেই তৎস্বরূপের বিষয় কেহ শিক্ষা দিতে পারে ; কারণ, বিদিত থেকে তা অন্যতর, ঊর্ধ্বে অবিদিতের ওপারে ; তাই শুনেছি আমরা পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে যাঁরা সেই তৎস্বরূপকে বোধগম্য করে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪

৪। বাক্যের দ্বারা যা অব্যক্ত থেকে যায়, বাক্য যাঁর দ্বারা ব্যক্ত হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যন্মনসা ন মনুতে যেন আহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫

৫। যিনি মনের দ্বারা চিন্তা করেন না, (অথবা মনের দ্বারা যাঁকে চিন্তা করা যায় না) যাঁর দ্বারা, বলেন জ্ঞানীরা, মনকে

মনন করা হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬

৬। যিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না,* যাঁর দ্বারা লোকে চক্ষুর দর্শন সব দেখে, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ করে তা ব্রহ্ম নয়।

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭

৭। যিনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন না,+ যাঁর দ্বারা শ্রুত সব শ্রবণ করা হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ করে তা ব্রহ্ম নয়।

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮

৮। যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করেন না, (অথবা, প্রাণবায়ুর দ্বারা যাঁকে নিঃশ্বাসে নেওয়া, অর্থাৎ আঘ্রাণ করা, যায় না) যাঁর দ্বারা প্রাণবায়ু তার পথ বেয়ে অগ্রে চালিত হয়, জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়।

---

* অথবা, "চক্ষুর দ্বারা যাঁকে কেহ দর্শন করে না"

+ অথবা, "কর্ণের দ্বারা যাঁকে কেহ শ্রবণ করে না

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ১

১। যদি তুমি মনে কর যে, ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জেনেছ তাহলে তুমি ব্রহ্মের রূপ অতি অল্পই জান। তাঁর যা তুমি, তাঁর যা আছে দেবতাদের মধ্যে, তাই তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। আমি মনে করি, তাঁকে জেনেছি।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২

২। আমি মনে করি না যে, তাঁকে উত্তমরূপে জেনেছি, তবে জানি যে, তিনি আমার অবিদিতও নন। আমাদের মধ্যে এই জ্ঞান যার হয়েছে সে-ই সে তৎস্বরূপকে জানে, সে জানে যে, তার কাছে তিনি অবিদিত নন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ স।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতং অবিজানতাম্ ॥ ৩

৩। যে তাঁকে মননের দ্বারা নির্ণয় করে না সেই তাঁকে মননে পায়, মননের দ্বারা যে তাঁকে নির্ণয় করে সে তাঁকে জানে না। যে তাঁকে বিশেষ করে জানতে চায় তার তিনি অবিজ্ঞাত, তিনি বিজ্ঞাত তাদেরই যারা তাঁকে বিশিষ্ট করে জানে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥ ৪

৪। প্রতিবোধের দ্বারা, অনুভবে প্রতিভাত করে' যে তাঁকে জানে সে-ই মননের দ্বারা তাঁকে জানে : কারণ সে অমৃতত্ব লাভ করে ; আত্মার দ্বারা লাভ হয় তাঁতে উপনীত হবার বীর্য, জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয় অমৃতত্ব।

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

৫। ইহলোকেই যে তাঁকে জানে তারই অস্তিত্ব সত্য, সফল ; ইহলোকে না জানলে মহৎ বিনাশ। ধীসম্পন্নব্যক্তিরা প্রতি ভূতে তাঁকে বিশেষ করে চয়ন করে', পৃথক করে' বেছে নিয়ে, ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে' অমৃত হন।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ;
ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

১। ব্রহ্ম দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করলেন, ব্রহ্মের সে বিজয়ে দেবতারা মহীয়ান হলেন। তাঁরা দেখলেন, "এ বিজয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই।"

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

২। ব্রহ্ম তাঁদের এই ভাব লক্ষ্য করলেন ; তৎস্বরূপ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না কি এই যক্ষ, এই পূজার্হ মহাভূত।

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি
কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৩

৩। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, "হে জাতবেদা, সর্বজন্মজ্ঞ, বিশেষ' করে জেনে এস এই যক্ষ কি।" তিনি বললেন, "তথাস্তু"।

তৃতীয় খণ্ড

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীত্যগ্নির্বা

অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪

৪। তিনি সে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন ; সে যক্ষ তাঁকে বললেন, "কে তুমি ?" তিনি বললেন "আমি অগ্নি, আমি সর্বজন্মজ্ঞ জাতবেদা।"

তস্মিংস্ত্বয়ি কিংবীর্যমিতি।

অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

৫। "সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নাম-গুণ-বান) কি বীর্য আছে ?" "সবই আমি দগ্ধ করতে পারি, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।

তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং।

স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং

বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ৬

৬। তিনি তাঁর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন ; "এটিকে দগ্ধ কর"। অগ্নি সেটির সন্নিকটে গেলেন, তাঁর সর্ববেগ দিয়েও সেটিকে পারলেন না দগ্ধ করতে। সেখানেই তিনি নিবৃত্ত হলেন, ফিরে এলেন ; "পারলাম না বুঝতে কে এই যক্ষ।"

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি

কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি ॥ ৭

৭। তখন তাঁরা বায়ুকে বললেন, "হে বায়ু তুমি জেনে এস কি এই যক্ষ।" "তথাস্তু।"

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্বা
অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

৮। বায়ু সে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন ; সে যক্ষ তাঁকে বললেন, "কে তুমি ? " তিনি বললেন "আমি বায়ু বা আমি মাতরিশ্বা, আকাশ-মাতার ক্রোড়ে বিচরণ করি।"

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিত্যপীদং
সর্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

৯। "সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নামগুণবান) কি বীর্য আছে ?" "এ সবই আমি নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই।"

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি
তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং।
স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ১০

১০। সে যক্ষ তার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন ; "এটিকে গ্রহণ কর।" তিনি তার সন্নিকটে গেলেন, সর্ববেগ প্রয়োগ করে তা গ্রহণ করতে পারলেন না। সেখানেই তিনি নিবৃত্ত হলেন, ফিরে এলেন ; "আমি পারলাম না বুঝতে কে এই যক্ষ।"

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।
তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ১১

১১। তখন তাঁরা ইন্দ্রকে বললেন, "হে মঘবন্, পূর্ণৈশ্বর্য-শালিন্, তুমি জেনে এস কে এই যক্ষ।" "তথাস্তু"। ইন্দ্র তাঁর

অভিমুখে ধাবিত হলেন। তাঁর সম্মুখ থেকে সে যক্ষ তিরোহিত হলেন।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদযক্ষমিতি ॥ ১২

১২। সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপের সাক্ষাৎ পেলেন, তিনিই হিমবানের কন্যা বহুরূপে দীপ্তিমতী উমা। তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই যক্ষ?"

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

১। সেই উমা ইন্দ্রকে বলেন, "এই ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই এই বিজয়, তার দ্বারা তোমরা মহিমা লাভ করবে।" তাতেই তিনি জানতে পারলেন যে, সেই যক্ষই ব্রহ্ম।

তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্দেবান্যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে
হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

২। সেই হেতুতেই এই দেবতারা যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন, এই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র, যাঁরা তৎস্বরূপের সমীপবর্তী হয়ে স্পর্শ করেছিলেন।*

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং
পস্পর্শ স হ্যেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

৩। সেই হেতুতেই ইন্দ্র যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন কারণ তিনি সন্নিহিততম হয়ে ব্রহ্মকে স্পর্শ করেছিলেন, কারণ তিনিই প্রথম সে যক্ষকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন।

* পূর্বযুগের শ্রুতিধর বা পরবর্তী লিপিকরদের ভ্রমের জন্য এই শ্লোকের অবশিষ্ট অংশ এমন বিকৃত হয়েছে যে পাঠোদ্ধারের আশা নাই। "তাঁরা তিনি প্রথম জানলেন যে, এই ব্রহ্ম"—এ উক্তি ঘটনার বিপরীত, অর্থহীন, ব্যাকরণদুষ্ট। তৃতীয় শ্লোকের শেষ অংশ দ্বিতীয় শ্লোকে প্রবেশ করে' তার শেষ অংশের স্থান নিয়েছে।

চতুর্থ খণ্ড

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্‌বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্‌
ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ৪

৪। সেই ব্রহ্মের নির্দেশ এই,—এই যে আমাদের উপর বিদ্যুতের স্ফুরণ অথবা এই যে চক্ষুর নিমেষ, এইরূপ হয় দেবতাদের যা তার মধ্যে, এই 'অধিদৈবত'।

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ॥ ৫

৫। তারপর 'অধ্যাত্ম', আত্মার যা তার মধ্যে,—যেমন এ মনের গতি সেই তৎস্বরূপের কাছে উপনীত হয় বলে বোধ হয়, এবং পরে তার সহায়ে সংকল্পের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাকে স্মরণ করে।

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং
বেদাভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

৬। তৎস্বরূপের নাম 'তদ্বন', সেই অনন্যসাপেক্ষ আনন্দ ; সেই আনন্দরূপেই তাঁকে উপাসনা করতে হবে। যিনি ব্রহ্মকে এভাবে জানেন সব জীব তাঁর সঙ্গ ইচ্ছা করে।

উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং
বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

৭। "আমাকে উপনিষদ উপদেশ দিন", বলেছিলে তুমি, এই তোমাকে উপনিষদ বলা হল। তোমাকে যা উপদেশ দিয়েছি সে ব্রহ্মেরই উপনিষদ।*

* 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, প্রত্যক্ উপলব্ধি যা চরম সত্যে প্রবেশ করে' তাতে অধিষ্ঠিত হয়।

তস্মৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদা
সর্বাংগানি সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

৮। সে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হল তপস্যা, দম ও কর্ম ; বেদ তার সর্বাঙ্গ ; সত্য তার আবাসস্থান।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

৯। যে এই জ্ঞান বিদিত হয় তার কাছ থেকে পাপ বিদূরিত হয় এবং সেই বৃহত্তর লোকে এবং অনন্ত স্বর্গে সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সত্যই সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কেনোপনিষদ

ব্যাখ্যা

১

অবতারণা—ঈশ ও কেন উপনিষদের বিষয়বস্তু

বারখানা প্রধান উপনিষদই লেখা হয়েছে একই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় নিয়ে ; কিন্তু তারা বিচারে অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ের বিভিন্ন দিক থেকে। ব্রহ্মবিদ্যার বিশাল রাজত্বে প্রত্যেকে প্রবেশ করেছে তার নিজস্ব দ্বার দিয়ে, চলেছে নিজের পথে নিজের ইচ্ছামত চক্র ঘুরে, লক্ষ্য রেখেছে নিজের উদ্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে। 'ঈশ' ও 'কেন' এ দুই উপনিষদেরই বিচার্য একই মহৎ সমস্যা : অমৃতত্ব-অর্জন, বিশ্বের ও মানব-চেতনার সঙ্গে দিব্য সর্বাধার সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মচেতনার সম্বন্ধ, আমাদের বর্তমান অবস্থার খণ্ডসত্তা-অজ্ঞান-দুঃখ অতিক্রম করে একত্ব-সত্য-আনন্দে উপনীত হবার উপায়। ঈশ উপনিষদের শেষ কথা হল পরম সুখের অভীপ্সা—'অগ্নে নয় রায়ে' ; তেমনি, কেন উপনিষদের শেষ কথা হল ব্রহ্মের আনন্দময় সংজ্ঞা—'তদ্ধ তদ্বনং নাম', আর ব্রহ্মকে আনন্দ-ময়রূপে উপাসনা ও সন্ধান করবার আদেশ। তবে, তাদের বিচারের অবতারণাতে প্রভেদ আছে, এমন কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও ভাবের পার্থক্য বেশ অনুভব করা যায়।

কারণ, এ উপনিষদ দুটির বিষয়-বস্তুও ঠিক অভিন্ন নয়। ঈশ নিয়েছে ব্যাপক প্রশ্ন : ব্রহ্মের পরম সত্যের সঙ্গে বিশ্বের, জীবনের, কর্মের ও মানব নিয়তির সম্বন্ধ নিয়ে যত সমস্যা ওঠে সে সবই।

পরমাত্মা আর তার সম্ভূতির, পরমেশ্বর আর তার ক্রিয়াকলাপের ধারণাকে সমাধানের সূত্র রূপে নিয়ে আঠারটি শ্লোকের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সে জীবনের প্রায় সমস্ত মূল সমস্যা দ্রুতগতিতে বিচার করেছে। তার প্রধান সুর হল সকল অস্তিত্বের একত্ব।

কেনোপনিষদ নিয়েছে সংকীর্ণতর সমস্যা, সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ প্রশ্ন তুলে সে তার বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছে। তার বিচার্য শুধু মানসচেতনার সঙ্গে ব্রহ্মচেতনার সম্বন্ধ, আর তার বিষয়ের এ নির্দিষ্ট সীমা সে কখনও লঙ্ঘন করে নাই। জড়জগৎ ও দৈহিক জীবন সে মেনেই নিয়েছে, তাদের উল্লেখই প্রায় করে নাই। কিন্তু স্থূল জগৎ ও দৈহিক জীবনের অস্তিত্ব আমাদের কাছে আছে ত শুধু আন্তর জীবনের প্রসাদে। আমাদের অন্তঃকরণ বাহ্য জগতের যে-প্রতিরূপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করে, মনের আদেশে আমাদের প্রাণশক্তি বাহ্য অভিঘাতের ও বাহ্য বিষয়ের যে-রকম ব্যবহার করে, আমাদের বাহ্য জীবন ও অস্তিত্ব সেই রকমই হয়। আমাদের মন ও আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে তাদের যে-রূপ প্রকাশ করে, বিশ্ব আমাদের কাছে তাই ; আমাদের জীবন যা হবে বলে আমাদের মানসপ্রকৃতি স্থির করে, আমাদের জীবন হয়ও তাই। সুতরাং, এ উপনিষদে প্রশ্ন তুলেছে : তাহলে মনের এই যন্ত্রগুলি কি ? যে মানসপ্রকৃতি বাহ্যজীবন ব্যবহার করে তা-ই বা কি ? এদের সাক্ষ্যই কি শেষ প্রমাণ ? এ-ই কি চরম ও শ্রেষ্ঠ শক্তি ? এই মনই কি সব ? না, এ মানব-অস্তিত্ব তার চেয়ে বৃহত্তর, সমর্থতর, দূরতর, গভীরতর অন্য কিছুর বহিরাবরণ মাত্র ?

এ উপনিষদের উত্তর হল যে, অন্তরালে আছে এক বৃহত্তর সত্তা, আর তার ক্রিয়ার সঙ্গে মন ও তার যন্ত্রগুলির সম্বন্ধ বাহ্যজগতের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধের অনুরূপ। জড় মনকে জানে না, মন জড়কে জানে ; জড়-দেহধারী জীব যখন মনের বিকাশ সাধন করে' মনোময় জীবে পরিণত

হয় তখনই সে তার মনোময় পুরুষকে জানতে পারে আর, সেই সত্তা দিয়ে, মনের কাছে জড়ের যা বাস্তবরূপ সেই রূপে জড়কেও সে জানতে পারে। তেমনি, মনের পশ্চাতে যা আছে মন তাকে জানে না কিন্তু তা মনকে জানে ; মনে নির্বর্তিত সত্তা যখন মনের বাহ্যবোধ থেকে তার সত্য সত্তাকে মুক্ত করতে পারে শুধু তখনই সে সেই সদ্বস্তুতে পরিণত হতে পারে, জানতে পারে যে সে-ও তা-ই, আর তখন তার দ্বারা মনের চেয়ে যা বাস্তবতর তার কাছে মনের যা বাস্তবরূপ সেই রূপে মনকে সে জানতে পারে। কি উপায়ে মন ও অন্তঃকরণের উপরে ওঠা যায়, কি উপায়ে নিজের অন্তরে প্রবেশ করা যায়, কি উপায়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়—এই হয় তাহলে মনোময় জীবের চরম লক্ষ্য, তার অস্তিত্বের সার প্রশ্ন।

কারণ, যদি স্বীকার করা যায় যে, মানস সত্তার চেয়ে বাস্তবতর সত্তা আছে এবং দৈহিক জীবন থেকে মহত্তর জীবন আছে, তাহলে এই রূপ-সমৃদ্ধ নিম্নতর জীবন কিংবা যেসব ভোগ-বিলাস সংসারে লোকে পূজা করে, অনুসন্ধান করে সেসব ত আর জাগ্রত' আত্মার কাম্য হতে পারে না। তার অভীপ্সা লোকাতিগ হবেই, বাহ্যপ্রত্যক্ষসার এই মর্ত্য জগৎ থেকে তাকে মুক্ত হতেই হবে, তবেই এসবের উপরে তার যে অমর-স্বভাব সত্তা আছে তা সে হতে পারবে। তার অস্তিত্ব সত্য হবে তখনই, যখন সে এই মর্ত্য জীবনেই নিজেকে মর্ত্য চেতনা থেকে মুক্ত করে' শাশ্বত অমর পুরুষকে জেনে তা হতে পারবে। তা না হলে তার মনে হবে যে, সে পথ হারিয়েছে, তার প্রকৃত শ্রেয় থেকে সে ভ্রষ্ট হয়েছে।

কিন্তু এ উপনিষদে বলছে না যে, সে ব্রহ্মচেতনা মনের গ্রাহ্য জড় বিশ্বে একেবারে পরদেশী বা দূরের জিনিষ, অথবা এ বিশ্বব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন। বরং ব্রহ্মই বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্তা,

মর্ত্য চেতনাতে দেবতাদের যে-শক্তি কাজ করে সে তাঁরই শক্তি, দেবতারা যে জয়ী ও মহীয়ান হন তার কারণ ব্রহ্ম যুদ্ধ করে জয়লাভ করে রেখেছেন। এ বিশ্ব তাহলে তার চেয়ে অনন্ত গুণে গরীয়ান, পূর্ণতর, বাস্তবতর অন্য কোন বস্তুর অবর-প্রকাশ বা বাহ্য-প্রতিরূপ।

কি সেই বস্তু? সর্বময় আনন্দ যা অনন্তসত্তা ও অমরশক্তি। মানুষের কর্তব্য সংসারে ভোগবিলাস সন্ধান করা নয়, সেই বিশুদ্ধ পরম আনন্দের পূজা ও অন্বেষণ করা। কি করে তাকে সন্ধান করতে হবে, এই হল সার প্রশ্ন আর নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে অনুসরণ করাই হল একমাত্র সত্য, পরম পুরুষার্থ।

২

চিরন্তন প্রশ্ন—প্রেরয়িতা কে?

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ১

মন নিম্নতর বা প্রাতিভাসিক চেতনার কাজ করে। মনের যন্ত্র হল জীবনীশক্তি বা প্রাণবায়ু, বাক্ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। প্রাণ বা নাড়ীতন্ত্রে সঞ্চারিণী জীবনীশক্তিই হল আসলে আমাদের মানস চেতনার একমাত্র প্রকৃষ্ট যন্ত্র। কারণ, তার দ্বারাই মন স্থূলজগতের স্পর্শ গ্রহণ করে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে, আর তার বিষয়ের উপর কাজ করে বাক্ ও অপর চারিটি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে; এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজই নির্ভর করে স্নায়বিক প্রাণ-শক্তির উপর। তাই এ উপনিষদে প্রথম জিজ্ঞাস্য হল, মন-প্রাণ-বাক্ ইন্দ্রিয়বৃত্তির মূল কারণ কি? তাদের চরম নিয়ন্তাই বা কি?

প্রশ্ন তোলা হল 'কেন'? কিসের বা কার দ্বারা? বিশ্বসম্বন্ধে পুরাতন মতে, আমাদের স্থূল অস্তিত্ব পঞ্চভূতে গড়া, আকাশ বায়বীয় আগ্নেয় তরল ও কঠিন—জড় ধাতুর এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার সংযোগে নির্মিত; তাই, আমাদের স্থূল অস্তিত্বের সম্পর্কিত যা কিছু আছে সেসবকে 'অধিভৌত' বলা হয়। মন-প্রাণের যেসব শক্তি জড়ের উপর কাজ করে সেসবের মধ্য দিয়ে এই স্থূল জগতে সূক্ষ্ম জড়াতীত শক্তিও কাজ করছে; তাদের বলা হয়, 'দেবতা' আর জড়াতীত ক্রিয়া সম্পর্কিত যা কিছু আছে আমাদের মধ্যে, তাকে বলা হয় 'অধিদৈব' বা দেবতাদের বিষয়ীভূত।

কিন্তু এই সূক্ষ্মশক্তিগুলির উপরে, তাদের ধারণ করে' রয়েছে তাদের চেয়ে মহত্তর চিন্ময় সত্তা বা আত্মন্ ; আর আমাদের মধ্যে এই মহত্তম সত্তার সম্পর্কিত যা কিছু আছে তাকে 'অধ্যাত্ম' বলা হয়। উপনিষদের ভাষায় আমাদের মধ্যে সূক্ষ্ম যা আছে, স্থূল জড়ধাতুর প্রতিপক্ষ মন-প্রাণ যার বিগ্রহ, তাই 'অধিদৈব', কারণ দেবতাদের বিশিষ্ট ক্রিয়া মন-প্রাণেই সম্পন্ন হয়।

স্থূল বা 'অধিভৌত' এ উপনিষদের বিষয়ের বাইরে ; 'অধিদৈব' ও 'অধ্যাত্ম', সূক্ষ্ম ও চিন্ময় সত্তার মধ্যে সম্বন্ধই তার বিচার্য। তবে, মন-প্রাণ-বাক্-ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বশক্তি-সমূহের দ্বারা, দেবতাদের দ্বারা, ইন্দ্র-বায়ু-অগ্নির দ্বারা। এই সব সূক্ষ্ম বিশ্ব শক্তি-সমূহই কি অস্তিত্বের আদি কারণ, মন-প্রাণের প্রকৃত প্রবর্তক ? না, তাদের সবার পশ্চাতে কোন উর্ধ্বতর সমন্বয়ী শক্তি আছে, স্বরূপতঃ যা এক ?

সুনিপুণ ধানুকীর ছোঁড়া তীর যেমন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পতিত হয়, প্রভুর আদেশে তার সচিব বা বার্তাবহ যেমন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তেমনি মন যে প্রেরিত হয়ে তার নির্দিষ্ট বিষয়ে পতিত হয় সে কার বা কিসের কাজে, কার বা কিসের বার্তা নিয়ে ? আমাদের অন্তরের বা বাহিরের কোন্ বস্তু সে, যা মনকে তার কাজে প্রণোদিত করে, যা মনকে দিশা দিয়ে চালিয়ে নেয় তার বিষয় পানে ?

তারপর, প্রাণ বা জীবনীশক্তি, আমাদের জৈব সত্তাতে ও নাড়ী-তন্ত্রে যা কাজ করে। এই উপনিষদে তাকে বলা হচ্ছে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ প্রাণবায়ু ; শ্রুতিতে অন্যত্র তাকে বলা হয়েছে 'মুখ্য' 'আসন্য', প্রধান বা মুখের বায়ু। তারই অন্তরে বিধৃত রয়েছে বাক্ বা সৃষ্টিপ্রবৃত্ত প্রকাশ-শক্তি। মানুষের দেহে 'পঞ্চপ্রাণ' বা প্রাণশক্তির পাঁচরকম ক্রিয়ার কথা বলা হয়। প্রথম, যাকে.বিশেষ করে 'প্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয়

তা দেহের উপরিভাগে সঞ্চরণ করে আর প্রকৃষ্টভাবে সেই প্রাণবায়ু; কারণ বিশ্ব-প্রাণশক্তিকে সর্বত্র ভিতরণ করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্যষ্টি আধারে সেই নামিয়ে আনে। দ্বিতীয়, 'অপান' দেহের নিম্নভাগে বিচরণ করে, প্রশ্বাস বা মৃত্যুবায়ু সে, কারণ প্রাণশক্তিকে সে দেহ থেকে বার করে দেয়। তৃতীয়, 'সমান', প্রাণ-অপানের মিলনস্থলে তাদের আদানপ্রদান নিয়ন্ত্রিত করে' তাদের সাম্য বিধান করে, জীবনী-শক্তি ও জৈব বৃত্তিগুলির ক্রিয়া-সাম্য বিধানের সে-ই প্রধান উপায়। চতুর্থ, 'ব্যান', ব্যাপক, দেহের সর্বত্র সে জৈব তেজ পরিবেশন করে। পঞ্চম, 'উদান', দেহ থেকে উপরদিকে মাথার তালু অবধি সঞ্চরণ করে, দৈহিক জীবনের সঙ্গে মহত্তর অধ্যাত্ম জীবনের আদানপ্রদানের প্রণালী সে। এদের কোনটিই প্রথম বা মুখ্য প্রাণ নয়। তবে প্রাণ তার নিকটতম অনুরূপ। যে প্রাণের উপর উপনিষদ এত জোর দিয়েছে তা হল বিশুদ্ধ প্রাণশক্তি,—প্রথম, কারণ অপর সব শক্তিই তার গৌণরূপ, তার থেকে তারা জন্মেছে, তার বিশেষবৃত্তি-রূপেই তারা কাজ করে। বেদে তার প্রতীক হল 'অশ্ব', তারই বিবিধ শক্তি দেবতাদের রথ টানে। এ উপনিষদের ভাষাও বেদের সেই ছবিই মনে করিয়ে দেয়: 'যুক্ত', রথে জোতা, 'প্রৈতি', অগ্রসর হয়, যেমন সারথির চালনায় রথের ঘোড়া তার পথ বেয়ে এগিয়ে চলে।

তাহলে, এই প্রাণশক্তিকে জগতের সব কাজে নিযুক্ত করেছে কে? অথবা নিজের চেয়ে বৃহত্তর কোন্ শক্তির জোরে প্রাণ তার পথে এগিয়ে চলেছে? এ প্রশ্ন ওঠে, কারণ প্রাণ মৌলিক শক্তি নয়, তার অস্তিত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তার কর্ম স্বতন্ত্র নয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে, তার পেছনে আর একটা শক্তি আছে যা তাকে তার পথের দিশা দেয়, তাকে চালায়, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে ব্যবহার করে। যে-বাক্যের দ্বারা আমরা আমাদের সংকল্প ভাবনা ও চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্ত সব ব্যক্ত করি,

জগতের কর্মপ্রবাহে ও নূতন সৃষ্টির উদ্যমের মধ্যে তাদের ছেড়ে দি সে বাক্য অন্তর থেকে তুলে এনে বাইরে প্রচার করতে পারি এই প্রাণ-বায়ুর শক্তিতে। সে বাক্যকে চালায় প্রাণবায়ু, তাকে গড়ে অগ্নি বা দেহ-মনে নিগূঢ় শক্তি, রূপনির্মাতা বহ্নিতেজ। কিন্তু এরা সব ত কর্মচারী মাত্র। তাদের অন্তরালে রয়েছে কোন্ সে গোপন শক্তি বা কে সে শক্তিমান, যিনি মানুষের বাক্যের ঈশ্বর, প্রকৃতপক্ষে যিনি বাক্যকে আকার দেন আর বাক্যে যা আত্মপ্রকাশ করে তার উদ্ভব যেখান থেকে হয়?

কানে শব্দ শোনে, চোখে রূপ দেখে; কিন্তু দেখাশোনা ত আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তিরই বিশেষ ক্রিয়া, আর তাদের ব্যবহার করে মন, যাতে মনোময় জীব যে জগতে বাস করে তার পরিচয় সে নিতে পারে, তাকে ইন্দ্রিয়বোধরূপে অবধারণ করতে পারে। প্রাণশক্তি তাদের রূপ দেয়, মন তাদের ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের বিষয় বা যন্ত্রগুলিকে আকার দেবার এবং সে-সব ব্যবহার করবার সামর্থ্য দেয় প্রাণ-মন ছাড়া অপর কিছু। কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে তাদের কাজে প্রবৃত্ত করেন? আলোর দেবতা সূর্য নন, দ্যৌ, আকাশ বা অন্তরীক্ষ লোক নয়, কারণ আলো-আকাশ ত দেখা-শোনার নিমিত্তকারণ মাত্র।

দেবতারা প্রত্যেকে তাঁদের অবদান এনে, সেসব মিলিয়ে স্থূল-জগতের সব ব্যাপার একত্র সংগ্রহ করেন আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করি মনোময় জগতের ব্যাপার বলে, কারণ আমাদের প্রত্যক্ষবোধের সেই একমাত্র পদ্ধতি। কিন্তু সমগ্র বিশ্বক্রিয়া এক অখণ্ড, বিশ্ব অকস্মাৎ আপতিত পরমাণু-সমূহের সমষ্টি নয় তা এক অবিভাজ্য; তার বিভিন্ন অংশ সুব্যবস্থিত হচ্ছে, তার বহুমুখী ক্রিয়া সুসঙ্গত হচ্ছে এক দ্বৈতরহিত সচেতন অস্তিত্বের প্রসাদে; আর সে অস্তিত্ব 'অকৃত', তাকে গড়া বা জোড়া দেওয়া যায় না, কিন্তু তা আছে এসব ব্যাপারের আগে থেকে।

দেবতারা কাজ করেন শুধু তাঁদের পূর্বে জাত এই শক্তি দিয়ে, জীবনধারণ করেন শুধু তার জীবন নিয়ে, ভাবেন শুধু তার চিন্তা দিয়ে, কর্ম করেন শুধু তারই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা নিজেদের মধ্যে এবং সব বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে দেখলে সেখানে সে সত্তাকে অহং-অস্তি-আত্মন্-রূপে অবগত হতে পারি—যেন আমার আমিত্ব, যেন একটা কিছু আছে যা যে-কোন ব্যষ্টি বা পৃথক সত্তা থেকে অন্যতর সংহততর বৃহত্তর।

কিন্তু মন যাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করতে পারে কিংবা ইন্দ্রিয় যাকে মনের গ্রাহ্য রূপ দিতে পারে, তার কিছুই ত সে নয়; তা হলে কি সে বা কে সে? কোন্ নিরুপাধিক চিৎ-সত্তা? কোন্ অদ্বিতীয় শাশ্বত পরমদেবতা? 'কো দেবঃ'?

৩

ইহলোক ও অমৃতত্ব

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ২

চিরন্তন প্রশ্ন এই উত্থাপন করা হল। এ প্রশ্ন মনে জাগলে মানুষের দৃষ্টি ফেরে দৃশ্য বাহ্য জগৎ থেকে পরম অন্তরতমের দিকে, সে এখন যা হয়েছে তার জানা এই ক্ষুদ্র সত্তা থেকে ক্রমশঃ নিজের পরিণতি সাধন করে' তাকে এখানেই যা হতে হবে সেই বৃহৎ অজ্ঞাতের দিকে ; কারণ, সে-ই তার প্রকৃত সত্তা এবং প্রপঞ্চ ও প্রতিভাসের ছদ্মবেশ ছেড়ে সে পরম সত্তাকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করতেই হবে। মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বার স্বয়ম্ভূ সৃষ্টি করেছেন রূপময় জগতের দিকে মুখ করে', কিন্তু যে-মানব একবার প্রগতির এই অনতিক্রমণীয় শাসনে ধরা দিয়েছে, সেই বহির্মুখী দ্বার দিয়ে এই মর্ত্য আপাতদৃশ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করে' সে ত আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, বাধ্য হয়ে তাকে অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নূতন সত্যের জগৎ নিরীক্ষণ করতেই হবে।

সে জানে যে ইহলোক তার অনেক কিছুই আছে, তা যতই অনিশ্চিত বা অপূর্ণ হক না কেন তার কাছে সে সবের আদর আছে। কারণ, তার আকিঞ্চন হল সত্তার বিস্তৃতি, জ্ঞানের প্রসার, ভোগ-সুখের ক্রমিক উপচয়, আর সেসব সে কিছু পরিমাণে পায়ও। এবং এসবের মূল্য তার কাছে এত বেশী যে, তার যতটুকু সে সংগ্রহ করতে পারে তারই বিনিময়ে সেসবের বিপরীত অভিঘাতের অবিরাম দুঃখ সে ভোগ করতে প্রস্তুত। সুতরাং, এখানে সে যা সন্ধান করে, আঁকড়ে ধরে' থাকে

সেসব যদি তাকে ছাড়তে হয় তাহলে ওপারের আকর্ষণ আরও অনেক বেশী প্রবলতর হওয়া চাই, গোপন প্রতিশ্রুতি তার চাই এতবড় কোন জিনিষের যাতে এখানকার যত কিছুই তাকে পরিত্যাগ করতে বলা হক না কেন সেসবের উপযুক্ত প্রতিমূল্য হবে। আছে সে প্রতিশ্রুতি :— বিস্তৃত সম্ভূতি নয়—অনন্ত সত্তা, সাপেক্ষ জ্ঞানের টুকরোগুলো তখনকার মত পূর্ণজ্ঞান বলে ভুল করে' চিরদিন জোড়া দেওয়া নয়— আমাদের স্বরূপ-চেতনার আর তার প্রকৃত সত্যের জ্যোতিঃ-প্রপাতের ভাগী হওয়া, আংশিক পরিতৃপ্তি নয়—পরমানন্দ। এককথায় অমরত্ব।

এ উপনিষদের ভাষা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জীবের অভীপ্সার এই যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল তা দার্শনিকের কোন অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব নয়, নীরব মহাশূন্য বা নির্বিশেষ পরব্রহ্ম নয়, বরং জীব যে অন্যোন্য-সম্বন্ধের জগতে বিচরণ করছে সেখানে তার যা কিছু থাকতে পারে সেসবের চরম পূর্ণতম রূপ। এখানে মানসলোকে আছে শুধু ক্ষুদ্র জ্যোতি এবং চেতনা ও প্রাণের ক্রমবৃদ্ধি, সেখানে অতিমানসে সবই অনন্তজীবন অনন্তজ্যোতি অনন্তচেতনা। এখানে যা অন্বেষণ করে' বা সন্তর্পণে অনুসরণ করে' আহরণ করতে হয় সেখানে তা অধিগত, এখানে যা অপূর্ণ সেখানে তা পূর্ণসিদ্ধ। 'লোকাতীত' অর্থে লোকের অবলুপ্তি নয় বরং এখানে সাকার জগতে আমরা যা সেসবের নবরূপায়ণ :— এই মনের সে হল সর্বক্ষম মন, এই প্রাণের সে গোপন প্রাণ, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে আশ্রয় দেয় ও সার্থক করে সে অব্যাহত সংবোধ।

আমরা নিজেদের ত্যাগ করি সত্য করে নিজেদের পাবার জন্য ; কারণ মনের দ্বারা চালিত এই জীবনে আছে শুধু খোঁজা, মনকে অতিক্রম না করলে পরম পাওয়া কখনও হয় না। সেই জন্যই আমাদের মনে হয় যেন, আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের পশ্চাতে আমাদের পূর্ণতার যে-রূপ

রয়েছে তার আকৃতি ও প্রকৃতি আমরা যা তার বিপরীত। কারণ, এখানে আমাদের আছে শুধু অবিরাম হওয়া—সম্ভূতিময় আমরা, সেখানে আমরা পাই আমাদের শাশ্বত সত্যসত্তাকে। এখানে আমরা আমাদের ধারণা করি বিপরিণামী চেতনা বলে', কালের তাড়নায় সদা ব্যাহত চেষ্টার ফলে তার পরিণতি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে; সেখানে আমরা অব্যয় চেতনা, কাল প্রভু নয় তার যন্ত্র মাত্র, তার স্পষ্ট ও দৃশ্য বিশ্বের ক্ষেত্র। আমরা এখানে, ক্ষণস্থায়ী জগৎরূপে যা প্রতিভাত হয় মর্ত্যচেতনার আরোপিত সেই ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি আর সেখানে, যে অনন্ত আত্মদর্শন নিখিল বিশ্বকে শাশ্বত অমর অস্তিত্বের আলোকে দেখে' জানে তার সব সুষমার মধ্যে মুক্তিলাভ করি। ওপারেই আমাদের প্রকৃত সত্তা, আমাদের ঐশ্বর্য, আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের চরম আপ্তকাম তৃপ্তি। সে-ই অমরত্ব, সে-ই পরম আনন্দ।

এখানে দেহকারারুদ্ধ মানসে, আমাদের অহং তার আন্তর ক্ষেত্র ও বাহ্য পরিবেশের প্রভু হতে, সে সব অধিকার করতে, অবিরাম চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই ধরে রেখে ভোগ করতে পারছে না, কারণ আমাদের কাছে যা অনাত্ম তাকে প্রকৃতভাবে অধিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সেখানে নিত্য সত্তার স্বাতন্ত্র্যে আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা বিনা বিরোধে, সবই যে সে নিজেই শুধু এই তথ্যেরই বলে, সবই পেতে পারে। এখানে রয়েছে আপাত মানব, সেখানে প্রকৃত মানব, অধ্যাত্ম পুরুষ; এখানে রয়েছেন দেবতারা, সেখানে পরম দৈবত; এখানে আছে বর্তমান থাকবার প্রয়াস, সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কবলে ফুটছে জীবনের মুকুল আর সেখানে আছে কেবল অস্তিত্ব, কালহীন অমরত্ব।

এই যে উত্তর দেওয়া হল, মূল প্রশ্নের ধরণের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে রয়েছে যে সত্য তা অবশ্যই এমন কিছু যা তাদের চেয়ে বৃহত্তর বলেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করে; সে-ই

মহেশ্বর, সবার স্বামী, পরম দেব। ঈশোপনিষদ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল সব অস্তিত্বের সমন্বয় করে, কেনোপনিষদ তাতে এসেছে ব্যতিরেকের পথে,—এই যেসব পদার্থ নিজেদের বাহিরের অপর কোন সত্তার শক্তির সাহায্যে এখানে নানা ভাবে বর্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে সর্বনিয়ন্তা স্ব-প্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের বৈপরীত্য বিচার করে। উভয়েই তার নিজস্ব বিচারের ধারা ধরে' এক সদ্বস্তুতে সকল বস্তুর সমাধান করে' চলেছে, কিন্তু উভয়েই উপস্থিত হয়েছে একই সিদ্ধান্তে। যে সদ্বস্তু সবের প্রভু ভোক্তা মহেশ্বর, তাঁকে পাওয়া যায় পৃথক সত্তা, পৃথক নিজস্ব, পৃথক আনন্দ অঞ্জলি দিয়ে।

ঈশোপনিষদের শ্রোতা প্রবুদ্ধ সাধক; কাজেই তার প্রথম কথা সর্বান্তর্যামী ঈশ্বর, তা থেকে এসেছে আত্মন্ সর্বভূত যার সম্ভূতি, শেষে আবার সে ফিরে এসেছে বিশ্ব-স্পন্দের পরমাত্মা সেই পরমেশ্বরে; কারণ, অজ অক্ষরের উপাসককে তাকে শেখাতে হবে কর্মের সাথকতা, অমরত্বের আনন্দের উপর এবং বিশ্বচেতনার সঙ্গে একীভূত ব্যক্তিচেতনার উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দিব্যজীবন। কেনোপনিষদ যাদের উদ্দেশ করছে তাদের কাছে বাহ্যজীবনের আকর্ষণ এখনও রয়েছে, তারা এখনও সম্পূর্ণ জাগেনি, সাধনা পুরোপুরি নেয় নি। তাই, তার প্রথম উক্তি হল, ব্রহ্ম মনের অতীত পরমাত্মা; তার থেকে এসেছে যে, ব্রহ্ম আমাদের মন ও প্রাণের সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় ঈশ্বর; কারণ তাকে তার শ্রোতার দৃষ্টি ফেরাতে হবে উপরদিকে, বাহ্য দৃশ্য জগতের ওপারে। কিন্তু কেনোপনিষদের প্রথম দুই অধ্যায়ে ঈশোপনিষদের আত্মন্ ও তার সম্ভূতির তত্ত্বই শিক্ষা দিচ্ছে, যদিচ অপেক্ষা-কৃত কম ব্যাপকভাবে এবং তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে; আর তার শেষ দুই অধ্যায়ে অন্য ভাষায়, চিন্তার অন্য সংজ্ঞা দিয়ে ঈশোপনিষদেরই পরমেশ্বর এবং তাঁর লীলার তত্ত্বের পুনরুক্তি করছে।

৪

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ—প্রতিভাস ও প্রকৃতসত্তা

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৩

এ উপনিষদের প্রথম উক্তি, আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে এই গভীরতর বৃহত্তর সমর্থতর চেতনার অস্তিত্ব। এর আদেশ, এই চেতনাই ব্রহ্ম। মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক্ এর কোনটাই পরম ব্রহ্ম নয়, এসব অভিব্যক্তির গৌণ রীতি বা বাহ্য যন্ত্র মাত্র। ব্রহ্মচেতনাই আমাদের সত্তা, আমাদের সত্য অস্তিত্ব।

দেহ বা মন আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়, পরিবর্ত্তনশীল বিগ্রহ বা প্রতিমা মাত্র, কালের প্রেরণাতে, আমাদের অতীত কর্মপ্রবৃত্তির প্রবেগসমূহের সমবায়ের ফলে তাদের আমরা নিরন্তর নির্মাণ করে চলেছি। কারণ, এই সব কর্মপ্রবৃত্তির কাহিনী পেছনে ফেলে এসেছি বলে যদিও আমরা সে-সবকে অতীত বা মৃত মনে করি তথাপি সে-সব সমষ্টিভাবে সর্বদা বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাদের কাজ হচেছ ও হবে।

তেমনি, অহং-ভাবও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। অহংজ্ঞান মনের একটি বৃত্তি মাত্র, আমাদের বিচারশীল তত্ত্বনির্ণয়ী মনের দ্বারা তা বিসৃষ্ট হয়েছে যাতে তাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়-মানসের অভিজ্ঞতাগুলিকে তার চারদিকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে, চাকার কীলকের মত প্রকৃতির গতি অটুট রাখাই তার কাজ। যন্ত্রের বেশী কিছু সে নয়, যদিও একথা সত্য যে, যতদিন আমরা সাধারণ মনোবৃত্তির মধ্যে,আবদ্ধ থাকব ততদিন

সেই মনোবৃত্তির প্রকৃতির দ্বারা ও অহং-যন্ত্রের প্রয়োজনের দ্বারা বাধ্য হয়েই এই অহংভাবকে আমাদের প্রকৃত সত্তা বলে ভুল করতে থাকব।

আবার, স্মৃতিও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। স্মৃতি আর একটি যন্ত্র, আমাদের জাগ্রত কর্মসমূহের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচক যন্ত্র। পারম্পর্যবোধ রক্ষা করবার জন্য অহং-বৃত্তি তাকে অবলম্বন ও আশ্রয়রূপে ব্যবহার করে, নতুবা সুপরিসর ক্ষেত্রে ব্যক্তির বহুমুখা ভোগের উপযোগা করে, মন ও প্রাণের ব্যাপারগুলি সুসম্বদ্ধভাবে সাজান যেত না। কিন্তু, এমনকি আমাদের মানস সত্তার ও যা উপাদান অথবা যা তাকে প্রভাবিত করছে, তার মধ্যেও এমন অনেক জিনিষই আছে যা স্মৃতিতে বর্তমান নেই, কিন্তু রয়েছে অবচেতনে, আমাদের উপরিচর সত্তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের অহংবোধের অবিচ্ছিন্নতার জন্য স্মৃতিশক্তির অবশ্য-প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তা আমাদের অহংবোধের উপাদান নয়, সত্তার ত নয়-ই।

তেমনি, আমাদের বিবেক বা নৈতিক ব্যক্তিত্বও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। সেত পরিণামী একটা বিগ্রহ বা নমনীয় একটা ছাঁচ, আমাদের আন্তর জীবন তাকে গড়ে' ব্যবহার করছে যাতে আমাদের মনের অপূর্ণতায় ভ্রান্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র চঞ্চল ভাবকে আমরা 'আমি' 'আমি' বলতে লোভ করতে পারি তার মধ্যে কথঞ্চিৎ স্থিরত্বের আভাস আসতে পারে।

কিংবা, এই যে-সমস্ত বিকারী ভাব সম্বন্ধে আমরা সচেতন, তার নীচে অবচেতনে যা কিছু আছে তার দ্বারা সমৃদ্ধ হলেও, তাদের সমষ্টি আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। আমরা যা হই সে ত জীবননদীর তরঙ্গ-সংগ্রহ, কালে প্রধাবিত অভিজ্ঞতার স্রোত, প্রকৃতিপ্রবাহের যে উর্মি-শীর্ষে আরোহণ করে' আমাদের মনোবৃত্তি চলে। আমরা যা সে হল

সেই জীবনের যে শাশ্বত স্বরূপ, সেইসব অভিজ্ঞতা বহন করে যে অব্যয় চেতনা, প্রকৃতির ও মনোবৃত্তির যা অমর উপদান।

কারণ, আমরা যা হই বা যে অভিজ্ঞতা লাভ করি সে-সবের পশ্চাতে সবার শাস্তা আছেন একজন যিনি সবের উদ্ভব করেন, সব ব্যবহার করেন, ভোগ করেন অথচ তাঁর স্বষ্টির নিমিত্ত কোন পরিবর্তনই তাঁর হয় না, তাঁর যন্ত্রের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না, তাঁর নিরূপণের দ্বারা তিনি বিশেষিত হন না, তাঁর উপর তাঁর ভোগের কোন ক্রিয়া হয় না। আমাদের মানস সত্তার আবরণের পশ্চাতে না গেলে সে-সত্তা যে কি তা আমরা জানতে পারি না ; কারণ মানস সত্তা জানতে পারে শুধু যা প্রভাবিত হয় বা যা নিরূপিত হয়, যার উপর কোন ক্রিয়া হয় বা যার পরিবর্তন হয়। মন সেই সদ্‌বস্তুর এইমাত্র বোধ গ্রহণ করতে পারে যেন আছে একটা কিছু আর আমরা যা অনির্বচনীয়ভাবে সে-ও তাই, সংজ্ঞা দেবার মতন করে মন যা জানতে পারে সে-সবের মত কিছু তা নয়। কারণ, আমাদের মনোবৃত্তি যে-মুহূর্তে এই 'কিছু'-কে নির্দিষ্ট করে ধরতে যায় তখনই প্রবাহ ও গতির মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে এবং মজ্‌জমানের তৃণাশ্রয়ের মত, বিশৃ-ঙ্খলার কল্লোলে নিরাপদ হবার আশায় তার কোন বিশেষ অংশ বা বৃত্তি অথবা কোন কল্পনা বা প্রতিভাসকে আঁকড়ে ধরে কিংবা অনন্তের মধ্য থেকে একটা সান্তরূপ কেটে বার করতে চেষ্টা করে' বলে 'এই আমি', 'এই আমি'। বেদের ভাষায়, মন যখন সে তৎস্বরূপের কাছে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে যায় তখনই তিনি অন্তর্হিত হন।

কিন্তু আমাদের মনের পশ্চাতে রয়েছে অন্যতর এই ব্রহ্মচেতনা, যা আমাদের মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ। তাতে উপনীত হলে আমরা আমাদের আত্মাতে উপনীত হই, প্রতিমূর্তি-স্বরূপ মন থেকে সরে গিয়ে প্রকৃত সত্যবস্তু ব্রহ্মে যেতে পারি।

প্রতিভাস ও প্রকৃত সত্তা

কিন্তু সেই সত্যবস্তুকে এই প্রতিভাসের সত্তা থেকে কি দিয়ে বিশেষিত করা যায়? অথবা—যেহেতু সংজ্ঞা হিসাবে আগেই যা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়, যেহেতু আমরা শুধু এইটুকু নির্দেশই দিতে পারি যে সে তৎস্বরূপ ইহলোক যা তা নন কিন্তু এখানে যা-কিছু আছে সে-সবের মনের দ্বারা অনির্বচনীয় পরম স্বরূপ, সেইজন্য—প্রশ্ন তুলতে হবে, কি সম্বন্ধ এই প্রতিভাসের সঙ্গে সেই সদ্‌বস্তুর? কারণ, এই সম্বন্ধের প্রশ্ন থেকেই এ উপনিষদের বিচারের সূত্রপাত হয়েছে; আর তার প্রথম প্রশ্নই ধরে নিচেছ যে, একটা কোন সম্বন্ধ আছে আর সেই সত্যবস্তু থেকেই এই বিশ্ব প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে, সেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

অবশ্য, সহজেই বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম আমাদের মন ইন্দ্রিয় বাক্ বা প্রাণশক্তির গোচর কোন বস্তু নন, অথবা দৃষ্ট শ্রুত ব্যক্ত, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত বা চিন্তা দিয়ে গড়া কোন বিষয় নন, অথবা জীবনের পরিণামী প্রগতিতে আমরা যা হতে পারি আমাদের দেহের বা মনের এমন কোন অবস্থা নন। কিন্তু এই উপনিষদের বিচারধারার চেষ্টা হল ব্রহ্মের এই সহজবোধ্য মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচরত্ব অস্বীকারের চেয়ে গভীরতর প্রতিধ্বনি আমাদের অন্তরের গহন গুহা থেকে জাগিয়ে তোলা। তার উক্তি হল যে, ব্রহ্ম মনের বিষয় বা প্রাণের নির্মাণ ত ননই, এমন কি তাঁর শাসনপ্রয়োগ বা তাঁর ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁকে কোন নির্ভরই করতে হয় না। যিনি মন দিয়ে চিন্তা করেন না, প্রাণ দিয়ে বাঁচেন না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধগ্রহণ করেন না, বাক্যে যাঁর প্রকাশ হয় না বরং যিনি এই সবকেই তাঁর শ্রেষ্ঠতর সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ চেতনার বিষয় করে নেন, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম মনকে মনন করেন মনের যা অতীত তা দিয়ে, দৃষ্টিকে দেখেন, শ্রুতিকে শোনেন সেই পরম সর্বাতিশয়ী দৃষ্টি ও শ্রুতির দ্বারা যা যন্ত্রসাপেক্ষ

বা প্রাতিভাসিক নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ও নিত্য-সিদ্ধ ; আমাদের অর্থব্যঞ্জক বাক্যকে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর সৃষ্টিপর পরাবাক্ থেকে ; এই যে প্রাণকে আমরা আঁকড়ে ধরে' থাকি তাকে তিনি সবেগে প্রেরণ করেন তাঁর সেই শক্তির শাশ্বত স্পন্দন থেকে যে-শক্তি খণ্ডরূপে বিভক্ত নয় ও নিজের অক্ষয্য আনন্ত্যের জন্য যার স্বাতন্ত্র্য নিত্য অব্যাহত। এ উপনিষদ তার প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করল এই ভাবে—ব্রহ্মকে প্রথম বর্ণনা করা হল মনের মন, শ্রোত্রের শোত্র, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ বলে'। তারপর এর প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে পর পর আরও বিস্তৃত করে বলা হল যাতে তার অর্থ বোধ, কথা দিয়ে যতটা পারা যায়, ততটা বিশদ ও ব্যাপক হয়। 'মনের যা মন' এই বাক্যের অনুগামী বিস্তৃততর বাক্য হল "মনের দ্বারা যা মনন করে না যার দ্বারা মন মত হয়" ; ইত্যাদি করে' প্রথম বর্ণনার প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে শেষসূত্র প্রাণের যে সংজ্ঞা 'প্রাণের যা প্রাণ' তার অনুগামী "প্রাণের দ্বারা যে বাঁচে না যার দ্বারা প্রাণশক্তি তার প্রগতির পথে প্রেরিত হয়" এই বিশদ বাক্য পর্যন্ত সবের ব্যাখ্যা করা হল।

আবার, এই বিশদ ব্যাখ্যার প্রত্যেকটি পংক্তির উপর জোর দেবার জন্য, "সেই ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর, মানুষ এখানে যা অন্বেষণ করে তা ব্রহ্ম নয়", এই আদেশের পুনরুক্তি করা হল। যে সত্যবস্তু আমাদের জানতে হবে, অন্বেষণ করতে হবে তা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক্য বা তাদের বিষয় বা অভিব্যক্তি, এ সবের কিছুই নয়। সত্যজ্ঞান সেই তৎ-স্বরূপকে জানা যিনি আমাদের জন্য এই সব যন্ত্র গড়েছেন কিন্তু যিনি নিজে তাদের ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। প্রকৃত অধিকার, প্রকৃত ভোগ হয় তাঁরই যিনি আমাদের কামনার এই সব বিষয় সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু নিজে কোন বিষয়ের অনুসরণ বা বাসনা করেন না, যিনি সব বস্তু নিয়েই তাঁর অমর সত্তার আনন্দে নিত্য পরিতৃপ্ত।

৫

বাক্যের বাক্

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৪

আমাদের বিচারে আমরা প্রথম স্থান দিই হয় মন ও ইন্দ্রিয়কে, না হয় প্রাণকে আর গৌণবৃত্তি বলে' বাক্যের স্থান দিই সবার পশ্চাতে ; কিন্তু এ উপনিষদে ন্যায়সম্মত এই সাধারণ পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম করে' ব্রহ্মের নেতিমূলক বর্ণনা কেন আরম্ভ করা হয়েছে "আমাদের বাক্যের যে বাক্য" এই উক্তি দিয়ে। আর, দেখতে পাই যে, তার উদ্দেশ্য হল আমাদের বাক্যের চেয়ে ঊর্ধ্বতর পরাবাক্, অবিকল্প যার পরম অভিব্যঞ্জনা, মানুষের ভাষা যার ছায়ামাত্র,—যেন কৃত্রিম অনুকরণের মত। কি ভাব রয়েছে উপনিষদের এই উক্তির পশ্চাতে, বাক্শক্তিকে এই প্রাধান্য দেবার মূলে ?

উপনিষদ অধ্যয়নের সময় আমাদের বর্তমান ধারণা সব অবিরাম বর্জন করে, প্রাচীন বেদান্তে ব্যবহৃত শব্দের পশ্চাতে যে আনুষঙ্গিক চিন্তার ধারা রয়েছে যথাসম্ভব অন্তরঙ্গভাবে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বৈদিক আম্নায়ে পরাবাক্ই সৃষ্টিকর্ত্রী, পরাবাক্ দিয়েই ব্রহ্ম নিখিল সাকার বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আর, আমাদের মনের উপলব্ধির ওপারে, অনন্তে নিত্য বর্তমান সত্যের নির্বিকল্প পরম অভিব্যঞ্জনাকে ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা এবং সত্যদৃষ্টি বা সত্য-শ্রুতিদ্বারা পুনরর্জন করতে চেষ্টা করা,—এই মাত্র হল

মানব বাক্যের চরম পরিণতির অবস্থা। সে পরাবাক্‌কে গড়বার শক্তিও, এই একই কারণে, আমাদের মনের নাই।

সৃষ্টিমাত্রই হল পরাবাকের দ্বারা অভিব্যক্তি; কিন্তু অভিব্যক্ত রূপ ত যে-বস্তু আছে তার প্রতীক বা প্রতিকৃতি মাত্র। মানুষের কথার বেলাতেও আমরা দেখতে পাই যে তাতে বিষয়ের মনোময় প্রতিরূপ আমাদের মনের সামনে ধারণ করে; কিন্তু যে-বিষয় সে প্রকাশ করতে চায় তাও আবার আর এক সদ্বস্তুর প্রতিরূপ বা অনুকৃতি। সেই সদ্ব-স্তুই ব্রহ্ম। পরাবাক্‌ দিয়ে ব্রহ্ম তাঁর নিজেরই কোন প্রতিরূপ বা প্রতিকৃতি ব্যক্ত করেন ইন্দ্রিয় ও সংবিতের গ্রাহ্য যেসব বিষয়বস্তু দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত তার মধ্যে, ঠিক যেমন সেই সব বিষয়েরই মানস অনুকৃতি ব্যক্ত হয় মানুষের বাক্যে। সে পরাবাক্‌কে সৃষ্টিপর বলা হয় মানুষের বাক্যের চেয়ে অনেক মৌলিকতর ও গভীরতর অর্থে, আর তার যে-শক্তি আছে মানুষের বাক্যের মহত্তম সৃষ্টিপরতা তারই সুদূরের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি।

এখানে উচ্চারিত অর্থে 'অভ্যুদিত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; তার আক্ষরিক অর্থ হল মনের সম্মুখীন হবার জন্য উত্থিত। এ উপ-নিষদ বলছে যে, এই ভাবে মনের সামনে বাক্যের দ্বারা যাকে তুলে ধরা যায় না সে-ই ব্রহ্ম।

দেখতে পাই যে, মানুষের কথাতে ফুটে ওঠে প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি: একমাত্র সদ্বস্তু ব্রহ্মের প্রতিরূপ হল সব বিষয়, আবার তারই মানস প্রতিরূপ হল বাক্যের প্রতিপাদ্য। নূতন সৃষ্টির একটু ক্ষমতা তার আছে বটে কিন্তু তারও দৌড় হল নূতন মানস প্রতিরূপ গড়া অবধি: পূর্বগৃহীত মানস প্রতিরূপসমূহ নিয়ে তাদের অদল-বদল করে' কালোপযোগী নূতন রূপ দেওয়া, এই পর্যন্ত। মানব বাক্যের এই সংকীর্ণ শক্তি থেকে দিব্য পরাবাকের যে মৌলিক সৃষ্টিশক্তির কথা প্রাচীন মনীষীরা বলেছেন তার কোন ধারণাই করা যায় না।

বাক্যের বাক্

কিন্তু, বহিস্তলের একটু নীচে, কিছু গভীরে নামলে মানব বাক্যের এমন একটা শক্তির সন্ধান পাই যাথেকে মৌলিক সৃজনী পরাবাকের কতকটা আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। জানি আমরা যে, রূপ সৃষ্টি—বা বিনাশ—করবার ক্ষমতা শব্দস্পন্দের আছে, আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের এ একটা অতি সাধারণ কথা। ধরে নেওয়া যাক যে, সকল রূপ-সৃষ্টির মূলেই রয়েছে শব্দস্পন্দ।

তারপর, মানুষের কথার সঙ্গে সাধারণ শব্দের সম্বন্ধ বিচার করা যাক। সহজেই দেখা যায় যে, মানুষের কথার ধ্বনি শব্দ উৎপাদনের সাধারণ তত্ত্বের একটা বিশেষ প্রয়োগ: তা হল মুখ ও কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যাবার সময় প্রশ্বাস বায়ুর চাপে তৈরি স্পন্দন। নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, তার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল স্বভাবিকভাবে, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কোন ঘটনা বা বস্তু দেখে ভাবের যে আবেগ উঠেছিল তা প্রকাশ করতে গিয়ে ; পরে, আমাদের মন তাকে ধরে কাজে লাগিয়েছে, প্রথমতঃ সেই বিষয়ের ধারণা করতে, পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে নানা ভাব প্রকাশ করতে। সুতরাং মনে হতেই পারে যে, প্রতীকরূপেই বাক্যের মূল্য, সৃষ্টিপর বলে নয়।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বাক্যের সৃষ্টিশক্তি আছে। তাতে ভাবাবেগের, মানস-প্রতিমার এবং কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন বৈদিক আম্নায়ের তত্ত্বে ও প্রয়োগে মন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা বাক্যের সৃষ্টিশক্তির বিশেষ প্রসার সাধন করা হয়েছিল। মন্ত্রবাদের তত্ত্ব হল যে, মন্ত্র শক্তিমান বাক্য, তার উদ্ভব হয় আমাদের অন্তরের গোপন গভীর থেকে, সেখানে মনের চেয়ে বৃহত্তর চেতনা (যেন তা' দিয়ে) তাকে সঞ্জীবিত করেছে, তাকে হৃদয় রচনা করেছে বুদ্ধি গড়েনি, অন্তরে তাকে সঞ্চিত রাখা হয়েছে আবার জাগ্রত মানস-সংবিৎ তার উপর একাগ্র হয়ে' পরিশেষে, বিশেষ করে সৃষ্টির কাজে, তাকে বাহিরে প্রেরণ করেছে, কখনও বা

সশব্দে কখনও বা নিঃশব্দে ;—আর এই নিঃশব্দ বাক্যকেই শব্দিত বাক্যের চেয়ে সমর্থতর বলে হয়ত ধরে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্র আমাদের চিত্তবৃত্তিতে নূতন ভাব সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের চৈত্যসত্তাকে পরিবর্তিত করতে পারে, যে-সব জ্ঞান বিদ্যা বা ক্ষমতা আমাদের পূর্বে ছিল না সেসব প্রকটিত করতে পারে এবং মন্ত্রের প্রযোক্তা ছাড়া অন্য লোকের ওপরেও এইসব কাজই করতে পারে ; শুধু তাই নয়, মন্ত্র মনোময় ও প্রাণময় লোকের পরিমণ্ডলে নানা স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে পারে, আর তার ফলে অভীষ্ট পরিণাম ও ক্রিয়া সাধিত হতে পারে, এমন কি জড়জগতে স্থূল আকারও নির্মিত হতে পারে।

বাস্তবিকই ত আমরা সাধারণ ভাবেই প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাক্যের দ্বারা আমাদের অন্তরে নানা চিন্তার স্পন্দন, চিন্তায় গড়া নানা রূপ জাগিয়ে তুলি, তার ফলে আমাদের দেহ ও প্রাণের বস্তুতে অনুরূপ স্পন্দন উঠে আর আমাদের নিজেদের উপর এবং অন্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় এবং পরিণামে পরোক্ষভাবে জড়জগতে কর্মপ্রবৃত্তি ও রূপসৃষ্টি হয়। কথিত ও অকথিত বাণীর দ্বারা মানুষ নিরন্তর মানুষকে প্রভাবিত করে' চলেছে ; আবার প্রকৃতির অপর সব ক্ষেত্রেও সে একই উপায়ে কাজ করে' চলেছে, যদিও কথঞ্চিৎ কম সাক্ষাৎভাবে, কম প্রতাপে। কিন্তু মূর্খের মত আমরা বিশ্বের বাহ্যরূপ ও প্রতিভাসে লিপ্ত থাকি এবং তার জড়োত্তর কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করবার কষ্ট স্বীকার করি না, তাই আমরা এইসব প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যাই।

বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগে বাক্যের এই গুহ্য শক্তিকে সজ্ঞানে কাজে লাগান হয়। আর তার মূলে যে-তথ্য রয়েছে তার সঙ্গে যদি আমরা আমাদের পূর্ব-প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণ করি যে, প্রত্যেক রূপসৃষ্টির পশ্চাতেই রয়েছে শব্দের সৃষ্টিপর স্পন্দবৃত্তি, তাহলে আমরা সৃষ্টিপর পরাবাকের মর্মগ্রহণের উপক্রম করতে পারব। ধরে নেওয়া যাক যে,

শব্দস্পন্দ সজ্ঞানে ব্যবহার করে, তদনুযায়ী আকারের উদ্ভব বা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু প্রাচীন দৃষ্টিতে জড় ত অস্তিত্বের নিম্নতম স্তর। তাহলে বুঝতে হবে যে, জড়ক্ষেত্রে শব্দস্পন্দ উঠবার পূর্বে প্রাণে অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে, তা না হলে জড়ক্ষেত্রে স্পন্দ-বিলাস অসম্ভব হত ; আবার তারও পূর্বে তার কারণভূত অনুরূপ স্পন্দন উঠছে মনোভূমিতে ; আবার, মনের স্পন্দন থেকে সূচিত হচেছ যে, তারও কারণভূত অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে সব বস্তুর মূলকারণ অতিমানসে। কিন্তু মানস স্পন্দনের লক্ষণ হল চিন্তা এবং বোধ, আর অতিমানস স্পন্দনের লক্ষণ পরাদৃষ্টি ও পরাপ্রজ্ঞা। তাহলে, সে ঊর্ধ্বলোকে শব্দের প্রত্যেক স্পন্দন বস্তুর কোন না কোন সত্যের সম্যক অনুভব বা পরম বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচেছ, তাকে প্রকাশ করছে আর সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী সৃষ্টিও করছে ; তার গর্ভে নিহিত কোন পরম শক্তি তার দৃষ্ট সেই সত্যকে মূর্ত করছে এবং ক্রমশঃ নিম্নতর লোকে অবতরণ করে' পরিশেষে স্থূল আকাশের শব্দ দিয়ে তাকে জড়ভূতে গড়া স্থূল আকারে রূপায়িত করছে। সুতরাং দেখা গেল যে, পরাবাক্ পরম সত্যের অবিকল্প প্রকাশরূপে সৃষ্টির আদি-কারণ, আর আকাশের শব্দ জড় ভূতের সৃষ্টির কারণ, এই দুইটি প্রকল্প পরস্পর অনুগামী, একই ধারণার যুক্তিসঙ্গত দুই কোটি। উভয়েই সেই একই প্রাচীন বৈদিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

তাহলে, এই হল পরাবাক্, আমাদের বাক্যের বাক্য। শুদ্ধ সৎ-এর স্পন্দন সে, সর্বক্ষম অনন্ত চেতনার প্রতীতি ও সৃজনের শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত, মনের পশ্চাতের দিব্যমনের দ্বারা বস্তুর পরম সত্যের দ্যোতক নিত্যসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নামের আকারে রূপায়িত ; যে-কোন লোকে বা যে-কোন উপাদান দিয়ে হক না কেন, সব মূর্তি গঠিত হয়েছে, সব স্থূল অভিব্যক্তি সাধিত হয়েছে তারই সৃষ্টিশক্তির সহায়ে। বাক্প্রয়োগে প্রবৃত্ত অতিমানসই শব্দব্রহ্ম, Creative Logos।

পরাবাকের সব বীজধ্বনি আছে ; বেদের নিত্য অক্ষর, ওঁ, এবং তান্ত্রিকদের সব বীজমন্ত্রের সূচনা তা থেকেই এসেছে ; সব বস্তুর সারতত্ত্ব তাদের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। পরা-বাকের বিশেষ সব রূপ রয়েছে যা মানুষের মহত্তম বৃত্তিগুলির কাছে ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ থেকে যে-সব বাণী আসে তাদের জুগিয়ে দেয়, এবং সেই সবের দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুর রূপ অমোঘভাবে নির্দিষ্ট হয়। তার নিজস্ব সব ছন্দ আছে কারণ তার স্পন্দন ত শৃঙ্খলারহিত নয়. বৃহৎ বিশ্বনৃত্যের তালে তার বিকিরণ হয় ; আর সে যে-জগৎ গড়ে তার সব ধর্ম ও প্রকৃতি, তার সংস্থান, তার সৌষম্য, তার অভিব্যক্তির ধারা সেই সব ছন্দের অনুযায়ী হয়। এমন কি, প্রাণও ভগবানের একটা ছন্দলীলা।

কিন্তু এ জগতে পরাবাকের দ্বারা যা 'অভ্যুদিত' বা অভিব্যক্ত হয় তা কি ? ব্রহ্ম নন কিন্তু ব্রহ্মের সব প্রতিকৃতি বা প্রতিভাস। পরাবাকের দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা হয় না, তা সম্ভব নয় ; তিনি নিজেকে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করেন না, তাঁর আত্মসংবিতের কাছে তিনি স্বতঃই বিদিত, এমনকি তাঁর যে-সব সত্য সাকার বিশ্বের নিখিল বস্তুর প্রচ্ছন্ন আধার সে-সবও তাঁর নিত্যদৃষ্টির কাছে সর্বদা স্বতঃই ব্যক্ত থাকে। বাক্য সৃষ্টি করে এবং প্রকাশ করে বটে কিন্তু তা-ও নিজেই সৃষ্ট, অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হন না, বাক্যই ব্রহ্মের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

সুতরাং আমাদের অন্বেষণের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে বিশ্বব্যাপার বা প্রতিভাসসমূহকে নয়, সেসবকে যে-পরাবাক্ আমাদের সংবিতের পর্যবেক্ষণের উপযোগী করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির অন্বেষণের বিষয় করে' সাকার বিগ্রহে বিসৃষ্ট করেছিল, সেই পরাবাক্‌কে যে তৎস্বরূপ নিজের অভ্যন্তর থেকে তুলে এনেছেন, 'অভ্যুদিত' করেছেন, তাঁকে—অর্থাৎ বিশ্বকারণ পরমসত্তাকে।

বাক্যের বাক্

মানুষের ভাষার অভিব্যক্তি হয় গৌণ, যৌগিক ; দিব্য পরাবাকের—শাশ্বত কবি ও মনীষী, বিশ্ব-সুষমার সুরশিল্পী, জগৎ-স্রষ্টার সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম বাক্যের সব বীজধ্বনির, মনোজ্ঞ ছন্দের, ও মর্মোদ্ভাসক শব্দ-যোজনার—ক্ষীণতম আভাসমাত্র আসে মানুষের মহত্তম বাক্যে। মানব-প্রতিভা তার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাতে যে বাণী পেতে পারে—পরম সত্যকে অবিতর্কিতভাবে যা প্রকাশ করে অথবা পরম শক্তিমান যে অক্ষর বা মন্ত্র—তাও তার সুদূরপ্রসৃত প্রতিচ্ছবি।

৬

মন

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৫

এ উপনিষদ যেমন আমাদের বাক্যের পশ্চাতে ব্রহ্মচেতনার অভি-ব্যঞ্জনার স্ব-রূপ পরাবাকের উল্লেখ করেছে তেমনি আবার এই মনের পশ্চাতে তার জ্ঞানের স্বরূপ দিব্য মনের উল্লেখ করেছে। অতএব আমাদের বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরাবাকের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু যেমন আমরা বিচার করেছি, তেমনি এখন আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে যে, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাত্মক বৃত্তি বা তত্ত্ব স্বীকার করবার কি যুক্তিসঙ্গত হেতু থাকতে পারে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা দিব্য পরাবাকের অস্তিত্ব যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে সে পরাবাক্ এবং তার সমগ্র অভিব্যঞ্জনা জানতে সমর্থ দিব্য-মনের অস্তিত্বও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু, দিব্যমন প্রতিষ্ঠার পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট নয়; কারণ পরাবাক্ আমরা গ্রহণ করেছি প্রকল্পনা-রূপে, বিচারসহ সম্ভাবনা হিসাবে। কিন্তু মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবৃত্তি এসে যায় মনেরই স্বভাব বিচার করে' তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে, আর সে সিদ্ধান্ত ন্যায়মতে অপরিহার্য।

প্রাচীন আম্নায়ে দেহান্তের পরেও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিত বলে তার কাছে অতি গভীর ও মূলগত অর্থে মনই ছিল মানব। এই পৃথিবীতে প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র বিচারশীল, একমাত্র মননক্ষম জাতি; শুধু তাই নয়, স্বরূপতঃ সে পার্থিব দেহধারী জীব, 'মনু'। সর্বজীবে

এক অবিভক্ত আত্মন্ বা পুরুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিয়েও দেহ মানবের ব্যবহারিক সত্তাও নয়, দৈহিক জীবনও সে নয়; এই দুয়েরই বিনাশ হতে পারে কিন্তু মানব বর্তমান থাকে। কিন্তু মনোময় সত্তারও যদি বিনাশ হয় তবে মানব-রূপে মানবের অস্তিত্ব শেষ হয়, কারণ তার আধারের কেন্দ্র ও সন্ধি হল মন।

অপরপক্ষে, বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সমর্থিত দৈহিক অভিব্যক্তি-বাদের মতে, মানুষ বস্তুতঃ জড় বই নয়, পরিবেশের অভিঘাতে অনুভব-সামর্থ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়ে তাতে মনের উদ্ভব হয়েছে, এবং জড়পদার্থই তার অস্তিত্বের ভিত্তি বলে' দেহ বিনাশের পরে দেহের ভৌতিক উপাদান-গুলি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু এ সংজ্ঞা, বড়জোর, তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর কোন সত্যের বাহ্য নিকৃষ্টতর অনুবৃত্তি। জড়পদার্থ মনের বিকাশ সাধন করতে পারত না যদি যে-শক্তি স্থূল আকার গঠন করে তার অভ্যন্তরে বা পশ্চাতে আত্মবিকাশপ্রয়াসী মনের তত্ত্ব আগে থেকেই বর্তমান না থাকত। মন অভিব্যক্ত হবার পূর্বেও আমাদের কাছে যা নিশ্চেতন বলে' মনে হয় তার মধ্যে দেহ-প্রাণকে জ্ঞানদীপ্ত করবার এবং সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত করবার সংকল্প নিশ্চয়ই আগে থেকেই বর্ত্তমান ছিল। কারণ, মনের এরকম কোন অবশ্য-প্রয়োজন যদি জড়ে না থাকত, মনোবৃত্তির মূল উপাদান এবং আধারকে মনোময় করবার সংকল্প যদি আগে থেকেই তার মধ্যে বর্ত্তমান না থাকত তবে মনের ক্রমবিকাশ কিছুতেই সম্ভবপর হত না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাসায়নিক যে-সব উপাদানে জড়রূপ গঠিত সেসবের মধ্যে, কিংবা বিদ্যুতে বা অন্য কোন শুদ্ধমাত্র জড় কারণের মধ্যে, তার অধিকারে বা তাকে অধিকার করে' যে অচেতন ইচ্ছাশক্তি বা সংবেদনই থাকুক না কেন, তার মধ্যে এমন কিছুই আবিষ্কার করা যায় না যাথেকে সজ্ঞান সংবেদনের আবির্ভাব বোঝা যেতে পারে বা যাকে চিন্তাশক্তি

বিকাশের সংকল্প বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারে অথবা যাতে অচেতন জড় পদার্থের উপর এই রকমের ক্রমবিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা আরোপ করতে পারে। সুতরাং, মনের উৎস সন্ধান করতে হবে জড়রূপের মধ্যে নয়, জড়পদার্থে যে-শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে। তাহলে সে-শক্তি অবশ্যই সচেতন, আর না হয় তার সত্তার গর্ভে নিশ্চয়ই মনোময় চেতনার বীজ নিহিত রয়েছে আর, সেই হেতুতেই, সে-চেতনা বিকাশের সম্ভাবনা, এমন কি অবশ্যম্ভাবিতাও রয়েছে। এই অবরুদ্ধচেতনা প্রথমে স্থূল রূপের, পরে সেই সব স্থূল রূপের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের সৃজনে অভিনিবিষ্ট থাকে; তথাপি সুরু থেকে নিশ্চয়ই তার গোপন সংকল্প রয়েছে—তা সে যতদিনই নিরুদ্ধ বা অন্তর্লীন থাকুক না কেন—যে, শেষ পর্যন্ত এই সব সম্বন্ধের অনুরূপ সজ্ঞান প্রেয়ত্ব বা মনের কাছে অনুরূপ অর্থ বা মূল্য সৃষ্টি করে' সে সবকে জ্ঞানদীপ্ত করবে। তাহলে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই অবচেতনের মধ্যে মনের অবশ্যম্ভাবিতা গোপন রয়েছে, জড়ের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্রপাত একবার হলেই সেই বস্তুকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে। এই হল ধাতব পদার্থে, উদ্ভিদে এবং প্রাণীতে যে জৈব প্রতিক্রিয়া রয়েছে তার গুহ্যতত্ত্ব এবং হেতু।

অপরপক্ষে, যদি বলা যায় যে, মন এমনভাবে জড় ধাতুর মধ্যে নিরুদ্ধ হয়ে গোপনে আগে থেকেই বর্তমান ছিল না তাহলে ধরে' নিতে হয় যে, মন জড়ের বাহিরে কোথায়ও অবস্থান করে এবং জড়কে আপনার অন্তর্ভুক্ত করে' নেয় বা তার মধ্যে প্রবেশ করে; মেনে নিতে হয় যে, অস্তিত্বের একটা মনোময় ভূমি আছে যা জড়ক্ষেত্রের উপর চাপ দিচ্ছে এবং তাকে অধিকার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। তা যদি হয় তবে মনোময় সত্তা আদিতে জড়জগতের বাহিরে গঠিত হয়েছে বটে কিন্তু জড় জগতে মনকে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ধারণ ও প্রকাশ করবার উপযোগী করে'

সব দেহ প্রস্তুত করছে। কল্পনা করে' নিতে পারি যে, সে তার দেহ গঠন করে' তার মধ্যে প্রবেশ করে' তাকে অধিকার করে নিচ্ছে, যেন ভেঙ্গে ঢুকছে ; ঐতরেয় উপনিষদে* পুরুষের কথা যেমন বলা হয়েছে —দেহসৃষ্টি করে', তাকে 'বিদৃত' করে', জড়ে সবলে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে' তিনি তাতে প্রবেশ করেছেন। এই মত অনুসারে মানুষ হল সজীব দেহে অবতীর্ণ মনোময় পুরুষ আর দেহের বিলয় হলে সজ্ঞানে তার সমস্ত মনোবৃত্তি সঙ্গে নিয়ে সে তার দেহ ত্যাগ করে।

এই দুইটি মতবাদ পরস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং বলা যেতে পারে যে, তারা পরস্পর-অনুপূরক, আর দুটিকেই একত্র নিয়ে এক সমগ্র সত্য পাওয়া যায়। কারণ, জড়পদার্থে মনের নিবর্তন হলে বা স্থূল বিশ্বে জড়-শক্তিতে এবং তার সমস্ত গতি-বৃত্তিতে মন সুপ্তভাবে অবস্থান করলে যে জড়-তত্ত্বের রাজত্বের ঊর্ধ্বে বা ওপারে মনোময় জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না এমন কথা নাই। বস্তুতঃ, জড়াতীত লোকের বা অস্তিত্বের মনোময় ভূমির সাহায্যের এবং তার সব শক্তির চাপের উপর এইপ্রকার প্রচ্ছন্ন মনের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি নির্ভর ত করতেই পারে, অন্ততঃ তা' থেকে নিশ্চয়ই তার অনেক সুবিধা ত হতেই পারে।

বিশ্বসম্বন্ধে দুরকম ধারণা সর্বদাই সম্ভব। তার একমতে সববস্তুর অভিব্যক্তি অনুশীলন করে', বর্তমান জড়বিজ্ঞানের মত, জড়পদার্থকেই বিশ্বের আদি বলে' গ্রহণ করা হয় অথবা, সাংখ্যদর্শনের মত, জড়পদার্থ না হলেও একটা নির্বিশেষ অচেতন সক্রিয় শক্তি বা প্রকৃতিকে আদি বলে' এবং মন বুদ্ধিকেও তারই ক্রিয়া বলে' ধরে' নেওয়া হয়, চিন্ময় পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকলেও তা হয় সম্পূর্ণ বিবিক্ত, সচেতন হলেও নিষ্ক্রিয়। অন্য মতে, চিন্ময় পরমাত্মা বা পরমপুরুষই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত দুই-ই, প্রকৃতি তাঁর শক্তি মাত্র অথবা আকারের উপাদানরূপী নিজেরই

* ঐতরেয় উপনিষদ, ১।১২

উপর ক্রিয়াশীল তাঁরই চিন্ময় সত্তার শক্তি।* সব উপনিষদেরই এই মত। অবশ্য, অন্য সমস্ত স্তরের সব প্রমাণই স্বপ্ন বা মতিভ্রম বলে' বর্জন ক'রে' আমরা যদি শুদ্ধমাত্র স্থূল বিশ্বকেই পর্যবেক্ষণ করি আর, সেই সঙ্গে, আমাদের মনের যে-সব ক্রিয়া জড়ের সীমা অতিক্রম করে সে-সব ছেড়ে দিয়ে জড়পদার্থের সঙ্গে তার সাধারণ সমত্বই শুধু বিচার করি তাহলে জড়কেই সবের উদ্ভব বলে', অপরিহার্য আধার ও মূল বলে' গ্রহণ করতে বাধ্য হব। অন্যথা বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনিবার্য।

সে যাই হক, শুদ্ধমাত্র স্থূল বিশ্বের দিক থেকে দেখলেও, মানবের বিশিষ্ট মানবত্ব হল মনে ; সে-মন শারীর প্রাণে অধিষ্ঠান করে' তাকে ব্যবহার করে এবং যে-জড়ে সে-মন আবির্ভূত হয়েছে তার চেয়ে সে মহত্তর। মন জড়বিশ্বে পরমক্রতুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ; নিখিল বিশ্ব যে-শক্তি সৃষ্টি করেছে তার বাস্তব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগধারা এই পৃথিবীতে বর্তমানে যা দেখি তা থেকে তার অভিপ্রায় যতটা অনুমান করা যায় তাতে মনে হতে পারে যে, সে-শক্তি যে-বস্তু অভিব্যক্ত করতে চেষ্টা করছিল তা সাধিত হয়েছে মানুষের মধ্যে। মনের প্রচ্ছন্ন তত্ত্বকে সে উদ্ঘাটিত করেছে, তা এখন সজ্ঞানে ও সবিচারে প্রাণ ও দেহের উপর কাজ করতে পারছে। তাহলে কর্মপ্রবৃত্তির আদি থেকে যে-প্রয়োজন প্রকৃতি গোপনে তার হৃদয়ে বহন করে' এসেছে তা সিদ্ধ হয় মানবে, এই পৃথিবীতে অভিব্যঞ্জনক্ষম সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্যনাম বা Noumen হয় মানুষ, সে-ই হয় পৃথিবীতে বাস্তবে অভিব্যক্ত দেবতা।

কিন্তু, এসব সিদ্ধান্ত সত্য হয় শুধু যদি আমরা ধরে' নি যে, মনই হল পৃথিবীতে প্রকৃতির ক্রিয়ার চরম সূত্র। প্রকৃতপক্ষে, চেতনার প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য সব ব্যাপার, মনোবৃত্তির সব তথ্য, মানুষের নিজের

---

* যেমন, ঐতরেয় উপনিষদে দেখতে পাই যে, পরমাত্মা পুরুষের অবয়বকে প্রকৃতির সব ক্রিয়ার উদ্ভব রূপে ব্যবহার করেছেন। ১।১।৪

প্রকৃতির সব নিগূঢ় প্রবৃত্তি, তার অভীপ্সা এবং তার সব প্রয়োজন যদি আরও গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে দেখি যে, মানুষে অভিব্যক্তির শেষ নয়। এখন এখানে বাস্তবে যা সাধিত হয়েছে তার মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধ্য সে নয়। তার নীচে যেমন অনেক-কিছু আছে তেমনি তার উপরেও—সম্ভাব্যমাত্র হলেও—আছে আরও কিছু। যেমন স্থূলপ্রকৃতি তার ওপারের যে-রহস্য নিজের অন্তরে নিগূঢ় রেখেছিল পরে তাকে সৃষ্টিতে প্রকটিত করেছে মানুষের মধ্যে, তেমনি মানুষের অন্তরে নিগূঢ় রয়েছে তার ওপারের আর একটি রহস্য এবং মানুষকেই ক্রমে সে-রহস্যকে বাস্তব আলোকে প্রকটিত করতেই হবে। এই তার নিয়তি।

তা হতেই হবে, কারণ বস্তুর মূল তত্ত্ব মন নয়, কাজেই চরম পদও তা হতে পারে না। জড় যেমন তার মধ্যে তার নিজেরই নিগূঢ় প্রয়োজনরূপে প্রাণকে ধারণ করে' ছিল এবং কালে বাধ্য হয়ে তাকে জন্ম দিল, আর প্রাণ যেমন তার মধ্যে নিজেরই নিগূঢ় প্রয়োজনরূপে মনকে ধারণ করে' ছিল এবং কালে তার কুক্ষিস্থ সে জাতককে জন্ম দিতে বাধ্য হল, তেমনি মনও তার মধ্যে তার নিজের নিগূঢ় প্রয়োজনরূপে তার ওপারের কিছু ধারণ করে' আছে এবং সে-ও এখন চাপ দিচ্ছে সে পরম দেবজন্ম দেবার উদ্দেশ্যে।

যুক্তিসিদ্ধ এমন কি অবশ্যপ্রয়োজন আছে যাতে মনকে প্রকৃতির শেষ জন্ম বলে ধরে নেবার বাধা হয় আর যাতে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হই যে, তার ওপারে তারই দ্বারা সূচিত আরও কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তর পাই মনোবৃত্তির প্রকৃতি ও ক্রিয়া বিচার করে'। কারণ, অন্তঃ-করণের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে—চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বোধ। বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রিয়বোধ হল বিভক্তচেতনার বিষয়কে গ্রহণ করে' ভোগ করবার চেষ্টা, চিন্তা হল বিষয়ের সত্য গ্রহণ করে' তাকে

অধিকারে আনবার চেষ্টা আর ইচ্ছাশক্তি হল বিষয়ের সম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করে' তাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা। অন্ততঃ এসব বৃত্তির স্বরূপ, সহজাত প্রবৃত্তি ও অবচেতন অভিপ্রায় বিচার করলে এ তিনটিকে এই প্রকারের চেষ্টাই বলতে হয়। কিন্তু বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে চেষ্টার পরিবেশ ও ব্যবস্থা অনুকূল নয়, তার সাফল্যও অসম্পূর্ণ ; তার সংজ্ঞাতেই বাধা ব্যবধান অক্ষমতা সূচিত হচেছ। প্রাণ যেমন জড়ের সঙ্গে সংশ্লেষণ ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত, মনও তেমনি জড়ে অধিষ্ঠিত প্রাণের সঙ্গে সংশ্লেষণ ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত। জড় বা প্রাণ তাদের নিজস্ব ধর্মের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পায় নাই যার সাহায্যে এই সীমার বন্ধন জয় করতে পারে বা তার পরিধি পর্যাপ্তরূপে প্রসারিত করতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে তারা একটা নূতন তত্ত্ব নিজেদের মধ্যে আহ্বান করে' এনেছে : জড় এনেছে প্রাণকে, প্রাণ মনকে। মনও তার নিজের ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পাচেছ না যার সাহায্যে সে তার ক্রিয়াবৃত্তির উপর আরোপিত সীমা জয় করতে বা যথেষ্ট প্রসারিত করতে পারে ; তাই মনকেও বাধ্য হয়ে তার বাইরে থেকে তার চেয়ে স্বতন্ত্রতর সমর্থতর অপর কোন নূতন তত্ত্বকে তার মধ্যে আহ্বান করতে হবে।

অর্থাৎ, চেতনার সমস্ত সম্ভাব্যতা মনে নিঃশেষে মূর্ত হয় নাই, সুতরাং চেতনার শ্রেষ্ঠ বা চরম অভিব্যক্তি তা হতে পারে না। মন সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য হয় শুধু একটা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে তাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করতে ; সুতরাং স্বভাবতঃই তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এমন কোন তত্ত্ব বা বৃত্তি অবশ্যই আছে যা অনবগুণ্ঠিত সত্যকে সাক্ষাৎ দেখতে পারে, আছে নিত্যসিদ্ধ সত্যের অনুযায়ী নিত্য জ্ঞানবৃত্তি। বেদ বলছে, আছে সে তত্ত্ব—সে হল 'ঋতচিৎ', যা সত্যকে সাক্ষাৎ দর্শন করে, সত্য স্বতঃই যার নিত্য অধিকারে। মন

তার অন্তরের সংকল্পকে সফল করতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে-সম্ভাব্যতা নিয়ে সে কাজ করে বাস্তবে তাকে সম্পাদন করতে পারে বহু আয়াসে, আংশিক ও অনিশ্চিতভাবে ; সচেতন ক্রিয়াশক্তির নিশ্চয়ই এমন কোন বৃত্তি আছে যা প্রকৃতির আত্মবিকাশের স্বয়ংক্রিয় অচেতন তত্ত্বের অনুরূপ ; আর সে তত্ত্বের সন্ধান করতে হবে মনের চেয়ে বৃহত্তর চেতনারূপে। পরিশেষে, মনের অভীপ্সা রয়েছে যে, সে স্বরূপ হ্লাদগুণ,—সকল দ্রব্যের রস—গ্রহণ করবে, ভোগ করবে, কিন্তু সে পারে শুধু পরোক্ষ-ভাবে তার সান্নিধ্যে আসতে, শ্লথমুষ্টিতে তাকে ধারণ করতে, বাহ্যিক ভাবে খণ্ড খণ্ড করে' তাকে ভোগ করতে ; এমন কোন বৃত্তি নিশ্চয়ই আছে যা সাক্ষাৎভাবে তাতে উপনীত হতে পারে, যথাযথভাবে তাকে ধারণ করতে পারে, নির্বিঘ্নে অন্তরঙ্গভাবে তাকে ভোগ করতে পারে। বেদ বলছে, আছে শাশ্বত সুখময় চেতনা যা সব অভিজ্ঞতার মধুময় নিত্যরস বা সার হ্লাদ গুণের অনুরূপ, যা মানস ইন্দ্রিয়ের অনিশ্চিত অপ্রতুল ও অযথার্থ বোধের দ্বারা সীমিত নয়।

সুতরাং, যদি চেতনার এমন কোন গভীরতর তত্ত্ব থাকে, তাহলে মনকে নয়, সেই তত্ত্বকেই অভিব্যক্ত করবার আদিম ও মৌলিক অভিপ্রায় প্রথম থেকেই প্রকৃতির অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল আর শেষ পর্যন্ত কোথায়ও না কোথায়ও তা প্রকটিত হবেই। কিন্তু তাকে যে এখানেই মনের মধ্যেই অভিব্যক্ত হতে হবে—যেমন মন হয়েছে প্রাণে, প্রাণ জড়ে—সে অনুমানের কোন হেতু আছে কি ? আমাদের উত্তর—হাঁ, তা হবেই ; কারণ, যত অস্পষ্টভাবেই হক না কেন, সে প্রবেগ, সে অভীপ্সা আর মূলতঃ সে প্রয়োজন মনের নিজেরই আছে। উর্ধ্বতম স্তর থেকে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত রয়েছে একই নিয়মের রাজত্ব। জড়কে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রাণের সারবস্তু তাতে অনুস্যূত রয়েছে—যে-সব স্পন্দন, ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সঙ্কোচন-প্রসারণ, সম্মিলনের

এবং আকার-গঠনের ও পুষ্টির প্রবৃত্তিকে আমরা প্রাণেরই প্রকৃত স্বরূপ বলে' মনে করি তার সবই আছে; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে প্রাণতত্ত্ব জড় আধারে আবির্ভূত হতে পারে শুধু যখন জড়ের মধ্যে তার সংগঠনের উপযোগী অবস্থা প্রস্তুত হয়। তেমনি আবার, প্রাণের মধ্যেও মনের সার বস্তু অনুস্যূত রয়েছে, অচেতন-সংবেদন,* ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রচুর রয়েছে; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মনের তত্ত্ব তাতে আবির্ভূত হতে পারে শুধু যখন জীবন্ত জড়ে তার সংগঠনের অনুকূল জৈব অবস্থা প্রস্তুত হয়েছে। মনের মধ্যেও অতিমানসের সারবস্তু অনুস্যূত রয়েছে: মনোবৃত্তির ছদ্মবেশে রয়েছে সব সৌহার্দ্য, ঐক্য, সম্বোধি, সনাতন জ্ঞানের স্ফুরণ, ইচ্ছাশক্তির স্বয়ংসিদ্ধিসামর্থ্য; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অতিমানসতত্ত্ব তাতে আবির্ভূত হতে পারবে শুধু যখন মানুষে, মনোময় জীবে, তার সংগঠনের অনুকূল মানসিক অবস্থা প্রস্তুত হবে।

মানুষের ক্রমোন্নতিতে এই আবশ্যক অবস্থা প্রস্তুত হয়ে চলেছে, যেমন করে' ক্রমপরিণামের নিম্নতর স্তরে সব অনুরূপ অবস্থা প্রস্তুত হয়েছিল,—একই রকমের পারম্পর্য, গতিরোধ, বৈষম্য সব নিয়ে; কিন্তু তথাপি, তা ক্রমশঃ বেশী জ্ঞানদীপ্ত ও আত্মসচেতন হয়েছে, প্রায় সজ্ঞানে নিশ্চিত ভাবে নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তুত করে নিচ্ছে। তারপর এই অগ্রগতিতে দেখতে পাই যে আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অংশের উপর মনোযোগ কম হয়েছে, ভ্রমের ভীতি ক্ষীণ হয়েছে, অর্জিত ভূমি সংরক্ষণের আসক্তি হ্রাস হয়েছে; তাই আশা হয়, এমন কি নিঃসংশয় প্রত্যয় হয় যে, নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব যখন হবে তখন তার জন্য অবশিষ্ট মানবজাতিকে মানুষের তুলনায় পশুর মত হীন অবস্থায় ফেলে রেখে নূতন, সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর দেহী সৃষ্টি করতে হবে না বরং সমগ্র মানবজাতিকেই সেই উচ্চতর স্তরে তুলে নেওয়া যাবে। কারণ, প্রকৃতির সন্তানদের

---

* জড়বাদী হেকেলের ভাষা ব্যবহার করেছি, শব্দ যোজনাতে বিরোধাভাস সত্ত্বেও।

মধ্যে মানুষই প্রথম দেখিয়েছে যে, নিজের চেষ্টাতে এবং নিজেকে অতিক্রম করবার অভীপ্সার বলে নিজেকে পরিবর্তন করবার সামর্থ্য তার আছে।

এই সব বিবেচনা থেকে বিচারবুদ্ধি মনের অতীত দিব্যমনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে সে সিদ্ধান্ত আসে শুধু জড় থেকে ক্রমপরিণামের চরমপদ রূপে। কিন্তু এ উপনিষদে তাকে আসন দেওয়া হয়েছে মনের পূর্বজাত স্রষ্টা ও শাস্তারূপে—সে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রথম থেকেই সচেতন, পদার্থের মূল বস্তুর মধ্যেই শুধু তা অচেতন অবস্থাতে বিধৃত নয়। এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ছেড়ে দিলেও, অতিমানস-তত্ত্বের স্বরূপ থেকেই এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। কারণ, ঊর্ধ্বতম অবস্থাতে তার স্বরূপ হল শাশ্বত জ্ঞান, ইচ্ছা, আনন্দ ও চিন্ময় সত্তা ; সুতরাং, তা বস্তুতঃ অচিৎ কিন্তু কালে বিশ্বপরিণামের ফলে সচেতন হয়, এ সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হল যে, যদিও আমরা তার সম্বন্ধে অজ্ঞান তবু সে তত্ত্ব নিত্যচিন্ময় এবং এই বিশ্বের তা আদি কারণ। আমরা যে তার বিষয়ে অজ্ঞ তাতে প্রমাণ হয় না যে, তা আমাদের বিষয়ে অজ্ঞ ; এবং প্রকৃত পক্ষে, আমাদের এই জ্ঞানের অসামর্থ্যই এখন একমাত্র যুক্তি অবশিষ্ট রয়েছে যার উপর নির্ভর করে আমাদের মনের অতীত, তার নিজের সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বযোনি এই শাশ্বত মনকে অস্বীকার করা যায়।

পুরাতন প্রজ্ঞার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করবার অপর সব যুক্তিই বর্তমান জ্ঞানের উপচীয়মান আলোকে অপসারিত হচ্ছে বা হয়েছে।

৭

মনের মন

স্থতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আছে এক সর্ববিৎ বিজ্ঞান-তত্ত্ব যা মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বভাব গোচরসীমা ও সামর্থ্যে যা মনকে অতিক্রম করে' যায়। কারণ, এই উপনিষদ মনের অতীত মনের আদেশ করেছে সম্বোধি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বলে ; আবার বিশ্বের ক্রমপরিণতির তথ্য থেকেও তার অস্তিত্ব হয় সমানই অবশ্য-গ্রাহ্য। তাহলে মনের অতীত এই মন কি ? তার ক্রিয়া হয় কিরূপে ? কি উপায়ে আমরা তার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে বা তাকে লাভ করতে পারব ?

এই পরম বিজ্ঞানাত্মক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই উপনিষদ বলছে, প্রথমতঃ যে, তা মন বা ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বাহিরে ; দ্বিতীয়তঃ যে, তা নিজে মন দিয়ে চিন্তা করে না ; তৃতীয়তঃ যে, তা সেই যার দ্বারা মনকে মনন করা হয় বা মনোময় করা হয় ; চতুর্থতঃ যে, তা ব্রহ্মচেতনার প্রকৃত স্বভাব বা স্বরূপের বর্ণনা।

কিন্তু যখন বলি যে, 'মনের এই মন' ব্রহ্মচেতনার স্বভাব বা স্বরূপের বর্ণনা তখন ভুললে চলবে না যে, পরম ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় স্থতরাং বর্ণনার অতীত। ব্রহ্ম যে অজ্ঞেয় তার কারণ এ নয় যে, শূন্যত্ব বা নাস্তিত্বছাড়া তার আর কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না অথবা তার অস্তিত্ব সদাত্মক হলেও তার কোন আধেয় বা গুণ নাই ; কিন্তু তার কারণ যে, আমাদের জ্ঞান যে-সব বস্তুর ধারণা করতে পারে ব্রহ্ম সে সবের অতীত, এবং আমাদের

মনোবৃত্তির ধারণা ও বর্ণনা করবার যে-সব নিজস্ব প্রণালী আছে তার কিছুই ব্রহ্মে প্রয়োগ করা যায় না। আমরা যে-সব বস্তু জানি ব্রহ্মই তার সমষ্টির এবং তার প্রত্যেকটির পরম নির্বিকল্প সত্তা, কিন্তু তার কোনটিই বা সে-সবের সমষ্টি ব্রহ্মকে রিক্ত করতে পারে না বা তাঁর সম্পূর্ণ সত্তা লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত করতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মের সত্তার ধারা আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি তার থেকে অন্যতর, তাঁর একত্ব কোন-রূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাঁর বহুবিধ আনন্ত্য সব সংশ্লেষণের অতীত। সুতরাং 'মনের মন' বলে' বর্ণনা করা যায় ব্রহ্মের অনন্য-সাপেক্ষ পরমস্বরূপকে নয়, আমাদের মনোময় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে' ব্রহ্মের মূল স্বভাবকে। ব্রহ্মচেতনা হল সবিকল্পের উপর নির্বিকল্পের শাশ্বত দৃষ্টির ভঙ্গী।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়েও বলতে পারি যে, তা আমাদের মন বাক্য বা ইন্দ্রিয়ের গোচরসীমার বাহিরে। অথচ মনে হয় যে, জ্ঞান অর্জন ও প্রকাশ করবার জন্য মন বাক্য এবং ইন্দ্রিয়, মাত্র এই উপায় ক'টিই আমাদের আয়ত্তে আছে। তাহলে কি আমরা বলতে বাধ্য নই যে, এই ব্রহ্মচেতনাও আমাদের অজ্ঞেয় এবং আমরা যতদিন এ দেহে আছি ততদিন তাকে জানবার বা পাবার আশা আমাদের নাই? কিন্তু এই উপনিষদ ব্রহ্মকে জানতে এবং জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে পেতে আমাদের আদেশ দিচ্ছে,—কারণ, 'বিদ্ধি' ও 'অবেদীৎ' শব্দের উদ্দেশ্য হল যে-জ্ঞান আবিষ্কার করে, অধিকার করে; এবং পরে আবার আদেশ রয়েছে যে, এখানেই, এই দেহেই এবং এই পৃথিবীতেই, সেই ব্রহ্মকে জ্ঞানের দ্বারা পেতে হবে, নতুবা 'মহতী বিনষ্টি'—পরম সর্বনাশ। ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব এবং অজ্ঞেয়ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যের বেশী চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে এই উপনিষদের ব্যাখ্যাতে অনেক বিভ্রম এসে গেছে। সুতরাং আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য তার অর্থকে

খণ্ড খণ্ড করে না দেখে বরং এই উপনিষদে যথার্থ কি বলছে তা লক্ষ্য করতে হবে, বিশেষ করে' সর্বগ্রাহী সম্বোধির দ্বারা তার সমগ্র তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে হবে।

এ উপনিষদের বর্ণনা আরম্ভ হল এই বলে' যে, এই মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ বাক্যের শাস্তা আমাদেরই মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য ; তারপর এই সব বিতর্ক-যোগ্য উক্তির উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার মাঝে আমাদের সতর্ক করে' দেওয়া হল যেন তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে যথাযোগ্য সীমার বাইরে টেনে নেওয়া না হয় বা আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিঙ্নির্ণয়ের ইঙ্গিতের বেশী কিছু বলে' মনে করা না হয়। কারণ, মন বাক্ ইন্দ্রিয়, কিছুই ব্রহ্ম অবধি যেতে পারে না ; সুতরাং, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এসবের গোচরের অতীত, নতুবা তাদের নিজস্ব বৃত্তি ধরেই তারা ব্রহ্মকে লাভ করতে পারত। ব্রহ্মের বিষয় শিক্ষা দিতে উদ্যত হয়েও এ উপনিষদ বলছে, "আমরা জানি না, বুঝি না কি উপায়ে তাঁর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।" এখানে যে দুটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'বিদ্ম' ও 'বিজানীম', তার একটির অর্থ, মনে হয়, সহজভাবে অর্থবোধ করা বা জ্ঞানে উপলব্ধি করা আর অন্যটির অর্থ, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করে' তার সাকল্য এবং তার বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশের সমগ্রভাবে অর্থবোধ করা। ঠিক তার পরেই, এই সম্পূর্ণ অক্ষমতার হেতু বলা হল : "কারণ, ব্রহ্ম যা জ্ঞাত সে সব থেকে অন্যতর, যা অজ্ঞাত তার উর্ধ্বে ওপারে," সব অধিকার করে' যেন সবের অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত। জ্ঞাত হল যা কিছু আমরা আমাদের বর্তমান মনোবৃত্তি দিয়ে গ্রহণ করতে পারি, ধারণ করতে পারি—পরম ব্রহ্ম যা নন সে হল সেই সব, শুধু আমাদের ইন্দ্রিয় ও মানস সংবেদনের কাছে ব্রহ্মের রূপ ও প্রতিভাস। অজ্ঞাত হল যা জ্ঞাত বিষয়ের অতীত এবং অজ্ঞাত হলেও যা অজ্ঞেয় নয়,—যদি আমরা আমাদের

বৃত্তিগুলিকে প্রসারিত করতে পারি কিংবা যা আমাদের এখন নাই এমন সব বৃত্তি অর্জন করতে পারি।

তথাপি, এর ঠিক পরেই এই উপনিষদে তার প্রথম বর্ণনার দৃঢ়ভাবে পুনরুক্তি করে' এবং তার ব্যাখ্যা করে' তার বর্ণিত ব্রহ্মকে জানতে আদেশ দেওয়া হল। এখানে এ বিরোধের সদ্য সমাধান করা হল না, এ বাধা দূর করা হল দ্বিতীয় খণ্ডে আর সে জ্ঞানের উপায় নির্দেশ করা হল চতুর্থ খণ্ডে। এ বিরোধ আসে জ্ঞানেরই প্রকৃতি থেকে : জ্ঞান হল অনুসন্ধিৎসু চেতনার সঙ্গে অনুসন্ধেয় চেতনার সম্বন্ধ, আর যেখানে সে সম্বন্ধ লুপ্ত হয় সেখানে জ্ঞানের স্থলে আসে শুদ্ধ অদ্বয়ত্ব। আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি তাতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের বেশী কিছু হতে পারে না আর সে জ্ঞানের স্বরূপ হল বিশিষ্ট অদ্বয়ত্ব, যাকে অবলম্বন করে' আমরা জ্ঞান অতিক্রম করে' নির্বিকল্প অদ্বয়ত্বে উপনীত হতে পারি। দর্শনের এই তাত্ত্বিক পার্থক্য নির্দেশ করা এখানে প্রয়োজন যাতে জ্ঞানময় কোন সম্বন্ধকে আমরা পরম নির্বিকল্প ব'লে ভুল না করি কিংবা যাতে আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আবদ্ধ থেকে, সম্ভবপর সকল বর্ণনার অতীত এবং বর্ণনীয় সকল অভিজ্ঞতার পশ্চাতে, পরম নির্বিকল্পের মৌলিক বোধ হারিয়ে না ফেলি বা নিতে অক্ষম না হই। কিন্তু তাতে ত আর জ্ঞানে অধিগত শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, অভিজ্ঞতাতে উপলব্ধ সবিশেষ অদ্বয়ত্ব, মূল্যহীন বা নিরর্থক হয় না। বরং, এই বিশ্বে আমাদের অস্তিত্বের চরম সার্থকতা বলে' তারই উপর আমাদের সাধনার লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে যদি আমরা তা পেতে পারি—আর তাতে সীমাবদ্ধ হলে ত তাকে আর সত্য করে' পাওয়া হল না—তাহলে তার মধ্যেই এবং তাকে অবলম্বন করেই, এমন কি এই দেহ ধারণ করে'ও সর্বদা পরম নির্বিকল্পের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারব।

এই ঊর্ধ্বতম জ্ঞানলাভের উপায় হল মনের চেয়ে ঊর্ধ্বতর ক্রিয়া-বৃত্তিকে মনের মধ্যে আসতে দিয়ে মনকে অবিরত প্রস্তুত করা যতদিন না তার চেয়ে বৃহত্তর যে অতিমানস পরিশেষে তার স্থান গ্রহণ করবে তার কাছে সে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে। বস্তুতঃ, এই জগতে জড় থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে মনে আমাদের ক্রমবিবর্তন স্বাভাবিক প্রগতির যে নিয়মে শাসিত হয়েছে মনকেও তাই মেনে চলতে হবে। কারণ, প্রাণময় চেতনা যেমন অবরুদ্ধ জড় সত্তার সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং জড়ের নিজস্ব করণের সহায়ে অনধিগম্য, তেমনিই এই অতিমানস চেতনাও মনের বিভক্ত ও বিভাজনশীল প্রকৃতিব সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং তার নিজস্ব করণের সাহায্যে অনধিগম্য। কিন্তু জড়কে যেমন প্রাণের অভিব্যক্তির জন্য অবিরাম প্রস্তুত করা হচ্ছে যতক্ষণ না প্রাণ তার মধ্যে সঞ্চরণ করতে পারে, তাকে অধিকার করতে পারে, তার মধ্যে তার বিশিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালিয়ে নিতে পারে, এবং প্রাণকে যেমন মনের অভিব্যক্তির জন্য অবিরাম প্রস্তুত করা হচেছ যতক্ষণ না মন তাকে ব্যবহার করতে পারে, ক্রমশঃ উচচতর মনোময় অর্থের বা মূল্যবোধের দ্বারা তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভাসিত করতে পারে, মন ও মনের যা অতীত তার বেলাতেও ঠিক তাই করতে হবে।

আর এই প্রগতি সম্ভবপর হয়েছে কারণ এই সব বস্তুই একই সত্তার, একই চেতনার রূপভেদ মাত্র। জড়ে যা নিবর্তিত রয়েছে, জড়ের যা নিগূঢ় তাৎপর্য ও সার সত্তা প্রাণ তাকেই জড়ে প্রকটিত করে—যেন জড় অস্তিত্বের কাছে তার নিজেরই মর্ম, নিজেরই লক্ষ্য উদঘাটিত করে। তেমনই আবার, প্রাণের যা প্রকৃত তাৎপর্য, নিজের কাছে অস্পষ্ট হলেও যা তার সার স্বরূপ কিন্তু ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ সংগঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিপ্ত থাকে বলে সে নিজে যা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারে না, মন সে সবই প্রাণে প্রকটিত করে। তেমনই

আবার, অতিমানসকেও মনের মধ্যে অবতরণ করে' মনের কাছে মনের নিজের স্বরূপ প্রকটিত করতে হবে, তার ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ সংগঠন-বৈশিষ্ট্যে একান্ত অভিনিবেশ থেকে মনকে মুক্ত করতে হবে, যাতে মনোময় সত্তা তার বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই উপায়েই মানুষ সেই তৎ-স্বরূপের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যিনি তার অন্তর্যামী শাস্তা, যিনি তার মনকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী করেন, যিনি তার প্রাণশক্তিকে নির্দিষ্ট পথে চালনা করেন, যিনি তার সব ইন্দ্রিয়কে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-বৃত্তিতে নিযুক্ত করেন।

এই পরম জ্ঞানাত্মক তত্ত্ব মনের দ্বারা চিন্তা করে না। তার কাছে মনের ক্রিয়া নিকৃষ্টতর, গৌণ—তার নিজস্ব পদ্ধতির অনুযায়ী নয়। কারণ, বিভাজন ও সীমাবন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে' মনের কাজ করা সম্ভব-পর হয় শুধু নিম্নতর তমসাচ্ছন্ন অস্তিত্বের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে ; কিন্তু অতিমানস একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্বগ্রাহী ও সর্বগামী, তার ক্রিয়া সার্বভৌম এবং নিখিল সাকার বিশ্বের ওপারের শাশ্বত সর্বা-তিশয়ী বিশ্বযোনির সঙ্গে সে সজ্ঞানে নিত্যযুক্ত। অতিমানস ব্যক্তিকে দেখে বিশ্বের মধ্যে, ব্যক্তি থেকে অনুভবের আরম্ভ করে না বা তাকে পৃথক সত্তা বলে' গ্রহণ করে না। সে তূর্যাতীত থেকে আরম্ভ করে' বিশ্ব ও ব্যক্তিকে দেখে তাঁরই সম্পর্কে তারা যা সেই রূপে, তাঁরই উপাধি বা অভিজ্ঞতার সূত্র বলে', ব্যক্তি বা বিশ্ব থেকে আরম্ভ করে' তূর্যাতীতে যায় না। মন অবিরাম মনন করে' ও সংকল্প করে' জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করে ; জ্ঞান ও শক্তি অতিমানসের নিত্য অধিকারে আছে বলে'ই সে নিজেকে নানাপ্রকার জ্ঞান ও সংকল্পের কাজে অবাধে বিকিরণ করে। বিভক্ত সংবেদন নিয়ে মন হাতড়ে বেড়ায়, সহানুভূতির দ্বারা একত্বের কোন রকমের একটা ধারণাতে উপস্থিত হয় ; অতিমানস সব গ্রহণ

করে স্বতন্ত্র সর্বগ্রাহী সম্বোধের দ্বারা। তার ।নত্য নিবাস যে একত্বে নানাবিধ প্রেম ও সহানুভূতি তারই অভিব্যক্তির গৌণ লীলা মাত্র। অতিমানস সমগ্র থেকে আরম্ভ করে' তারই মধ্যে দেখে তার সব অংশ ও ধর্ম, অংশ ও ধর্মের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের দ্বারা সমগ্রের জ্ঞান নির্মাণ করে না; এমন কি সমগ্রতাও তার কাছে যোগফলের একত্ব মাত্র, অনন্ত স্বরূপতত্ত্বের মহত্তর একত্বের আংশিক এবং গৌণ প্রকাশ মাত্র।

সুতরাং দেখা গেল যে, এই দুটি জ্ঞানের তত্ত্ব দুইটি বিপরীত প্রান্ত থেকে বিপরীত অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করে, বিপরীত পদ্ধতিতে কাজ করে। তথাপি, জ্ঞানের নিম্নতর বৃত্তিটি উচ্চতরের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের যা অতীত তারই দ্বারা মনকে মনন করা হয়েছে; মনোময় চেতনা এই ঊর্ধ্বতর অতিমানস থেকে যে জ্ঞান ও প্রেরণা পায় তার দ্বারাই সে নিজের গতি-বৃত্তি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে; এমন কি যে উপাদানে সে নির্মিত হয়েছে তাও সেই মহত্তর তত্ত্বেরই বস্তু। মনো-বৃত্তির অস্তিত্ব আছে কারণ মনের যা অতীত তা নিজের সত্তার বিভিন্ন বিন্দুতে, বিভিন্ন বিগ্রহে অভিনিবেশের উপর প্রতিষ্ঠা করে' নিজের বিপরীত ক্রিয়াপ্রণালীর পরিকল্পনা করেছে। অতিমানসই এই সব বিন্দু স্থির করে দেয়, দেখে যে, কোন বিশেষ বিশ্বছন্দ বা সার্ব-ভৌম ক্রিয়ার ধর্ম দেওয়া থাকলে সেই সব নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তার নিজেরই অন্য সব বিগ্রহের উপরে এবং সেই সব বিগ্রহের চাপ মেনে নিয়ে কি ভাবে চেতনাকে কাজ করতে হয়; এই সব যা সে স্থির করে' দিয়েছে তারই অনুযায়ী করে' সে মনোবৃত্তির সমস্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, আর দেখে। এমন কি আমাদের অজ্ঞানও অতিমানস থেকে প্রসৃত কোন সত্যের বিকৃত ক্রিয়া এবং সেই সত্যের বিকাররূপে ছাড়া তার অস্তিত্ব থাকতে পারত না। আর ঠিক তেমন-ই, আমাদের জ্ঞান সংবেদন হৃদয়া-বেগ বা শক্তিতে, সত্যমিথ্যা শীতোষ্ণ রাগদ্বেষ ইত্যাদি, যত দ্বন্দ্ব সে

সবও সেই ঊর্ধ্বতর অববোধ থেকেই এসেছে, সবই তার আদেশ মেনে চলেছে, সবই সেই প্রচ্ছন্ন অতিমানসেরই গৌণ ক্রিয়া—বলা যেতে পারে, উন্মার্গ ক্রিয়া ; আর এই সব নিম্নতর ক্রিয়া অতিমানসই নিয়ন্ত্রণ করে তার সেই প্রথম পরিকল্পনার অনুযায়ী করে' যে, এ অবর চেতনা বিভক্তরূপে বিন্দুবিশেষে অবস্থিত বলে' তার জগতের বা নিজের স্বামিত্ব তার নাই বটে কিন্তু একত্ব ও স্বামিত্বের সন্ধান সে করে, কারণ আমাদের মধ্যে অতিমানস আছে বলে' সহজবোধে—যদিও অস্পষ্টভাবে—সে জানে যে, সেই তার প্রকৃত ধর্ম, তার স্বত্ব।

কিন্তু ঠিক সেই হেতুতেই আবার, তার উদ্ভব এবং গোপন দিশারী সেই মনের মনে উদয়নের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণে মনোময় সত্তা তার বিশিষ্ট মনোবৃত্তি ও স্বভাবের সীমা পরিত্যাগ করে, শুধু সেই অনুপাতেই তার সে অন্ধ সন্ধান এবং অর্জনের প্রয়াস সফল হতে পারে। অতিমানসকে তার মনোবৃত্তির অন্তরে প্রবেশ করতে দিতেই হবে, মনকে প্রাণ যেমন দিয়েছে। তার অন্বেষণের বিষয় বলে' এখন সে যা মেনে নিয়েছে—যথা, মন আর তার বিহিত সব লক্ষ্য, তার পঙ্গু ক্রিয়াপদ্ধতি, অহংবোধ বিভাজন ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নিজের গড়া সব সংকল্প সংস্কার ও ভাবাবেগ—সে সবকে যতদিন সে উপাসনা করে, অন্বেষণ করে বা সে সবে যতদিন সে আসক্ত থাকে ততদিন সে এই মতুকে অতিক্রম করে' এ উপনিষদে সাধককে যে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতে উন্নীত হতে পারে না। সেই ব্রহ্মকে আমাদের জানতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে ; এখানে মানুষ যা অনুসরণ করে, উপাসনা করে সে সবকে নয়।

৮

চক্ষুশ্রোত্র—ইন্দ্রিয় বোধের স্বরূপ

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৬-৭

এ উপনিষদ ব্রহ্মচেতনাকে 'মনের মন' সংজ্ঞা দিয়েই সন্তুষ্ট হয় নাই। ইতিপূর্বে যেমন তাকে 'বাক্যের বাক্' বলে' বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি এখন তাকে 'চক্ষুর চক্ষু' 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' বলা হল। সে চেতনা ত শুধু প্রকাশলীলার পশ্চাতে পরম জ্ঞানবৃত্তি নয়, সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পশ্চাতে পরম ইন্দ্রিয়ও বটে। আমাদের সত্তার প্রত্যেক অংশই তার নিজের সার্থকতার সন্ধান পায় তার স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার বর্তমান রূপের যা ওপারে তার মধ্যে, শুধু সে-সব রূপের মধ্যে নয়।

ইন্দ্রিয় ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে সর্বনিয়ন্তা পরমচেতনার এই ধারণার সমন্বয় হয় না। বাহ্য জড়ের সঙ্গে দেহাশ্রিত মনের সংযোগ সাধনের উপায়স্বরূপ দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বলেই আমরা ইন্দ্রিয়কে জানি; আর জানি যে, ক্রমবিবর্তনের ধারাতে এই সব ইন্দ্রিয়ের পৃথকভাবে পরিণতি হয়েছে; সুতরাং, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্তু নয়, শুধু দেহাশ্রিত মনের একটা ব্যবহারিক উপযোগ মাত্র, স্থূল বস্তুর উপরে তার সাময়িক প্রয়োগের প্রণালী মাত্র। অন্যদিকে, ব্রহ্মের ধারণা আমরা করি মৌলিক যা নয় সে-সবই বর্জন করে', এমন কি মনকেও বাদ দিয়ে। এ যেন সদাত্মক কোন শূন্য বা অজ্ঞেয় কোন রাশি যাকে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন পরিমাণের সম্ভাব্য কোন সমীকরণের অনুযায়ী করে' নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তা সত্য হতে পারে; কিন্তু

এখন আমরা অজ্ঞেয়ের কথা ভাবছি না, ভাবছি চেতনাতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তির কথা আর তাকেই আমরা বলেছি সবিকল্পের উপর নির্বিকল্পের শাশ্বত দৃষ্টিপাত ও এই বিশ্বের এবং আমরা যা হয়েছি তার কারণ ও নিয়ন্তা শক্তি। সেখানে, সেই সর্বনিয়ন্তা মূলকারণের মধ্যে মুখ্য ও অপরিহার্য এমন কছু অবশ্যই আছে যাকে দেহধারী চেতনার সংজ্ঞাতে ভাষান্তর করেই আমাদের এখানকার সব স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াবাত্ত রূপ নিয়েছে।

এদিকে, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্তু নয়, অন্ততঃ তা মনে হয় না; মনের নাড়ীতন্ত্র ব্যবহারের এ একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এমন কি, বিশুদ্ধ মনোময় ক্রিয়াও তা নয়; তাকে এতটা নির্ভর করতে হয় প্রাণশক্তির তরঙ্গের উপর, নাড়ীতন্ত্রের ঊর্ধ্বাধঃ-প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তেজের স্পন্দনের উপর যে, উপনিষদে তাকে প্রাণ আখ্যাই দিয়েছে,* প্রাণশক্তিরই বিবিধ ক্রিয়াবৃত্তি বা বিভূতি বলে তাদের গণনা করেছে। অবশ্য, স্নায়ুর উপর যেসব ছাপ পড়ে, মনের কাছে এলে মন তার নিজের সংজ্ঞাতে সেসবকে পরিবর্তিত করে' নেয়, কিন্তু শুদ্ধমাত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে ত মানসিকের চেয়ে বেশী স্নায়বিক বলেই মনে হয়। কোন রকমেই, প্রথম দৃষ্টিতে এমন কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না যাতে যার দেহ নাই, যে অতিমানস চেতনার এমন কোন যন্ত্রপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তার উপর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব আরোপ করা যেতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা নয়, এ শুধু তার বাহ্যরূপ; এ আবরণ ভেদ করে' তার পশ্চাতে আমাদের যেতে হবে। যে বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি—ক্রিয়াতে নয়—স্বরূপতঃ তা কি? তার ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, তা হল জড়ের কোন অণুবিম্বের সঙ্গে মনের সংস্পর্শ—তা সে অণুবিম্ব শব্দের স্পন্দনই হক,

* যথা, বৃহদারণ্যক ১।৫।২১; ৬।১।৪

কোন আকৃতির আলোক-প্রতিরূপই হক, গন্ধোৎপাদক ক্ষিতি-পরমাণু বৃষ্টিই হক, আস্বাদনের মূল দ্রব বা রসের অনুভবই হক, অথবা আমাদের স্নায়বিক সত্তাতে বিক্ষোভের যে সাক্ষাৎ-বোধকে আমরা স্পর্শ বলি তাই হক। অবশ্য, জড়ের সঙ্গে জড়ের সংস্পর্শ থেকেই এসব সংবেদনের প্রথম উদ্ভব হয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে মনের কারবার শুধু জড়ের অণুবিম্ব নিয়ে—যেমন, চোখের উপর পড়েছে কোন আকৃতির যে ছবি। কারণ, জড়ের উপর মন সাক্ষাৎভাবে কাজ করে না, করে প্রাণের সাহায্য নিয়ে—প্রাণই মনের আদানপ্রদানের যন্ত্র; আর আমাদের মধ্যে প্রাণের কাজ হয় স্নায়বিক শক্তিরূপে. জড়ীয় কোন রূপে নয়; কাজেই তা জড়কে ধরতে পারে শুধু স্নায়ুর উপর জড়ের যে ছাপ পড়ে তাকে আশ্রয় করে, যেন জড়ের সংস্পর্শজাত প্রতিচ্ছবি আমাদের তৈজস চেতনাতে—উপনিষদের ভাষায়, প্রাণে—অনুরূপ যে-বোধ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে। মন এই সব নিয়ে প্রত্যুত্তরে জাগায় তার অনুরূপ মনোময় বোধ—মনের উপর আকারের ছাপ। সুতরাং, অনুভূত পদার্থ আমাদের কাছে আসে তিনবার রূপান্তরিত হয়ে: প্রথম, জড় অণুবিম্ব, দ্বিতীয়, স্নায়বিক বা তৈজস প্রতিচ্ছবি, তৃতীয়, মনের বস্তুতে অনুকৃত প্রতিরূপ।

এই সবিস্তার প্রক্রিয়ার পারম্পর্য আমাদের অগোচর থাকে কারণ, কালগতির আমাদের বোধ অনুসারে তা তড়িদ্বেগে সম্পাদিত হয়। অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির জীবের কাছে, কাল-পরিমাণের ভিন্ন সংজ্ঞাতে, এ-ক্রিয়ার প্রত্যেক অঙ্গই হয়তঃ পৃথকভাবে বোধগম্য হবে। কিন্তু তিনবার রূপান্তর হওয়া সর্বত্রই থাকবে; কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে চেতনার তিনটি কোষ আছে:—জড়ীয়, 'অন্নকোষ', যাতে বাস্তব সংস্পর্শ ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি গৃহীত ও রূপায়িত হয়; জৈব বা স্নায়বিক, 'প্রাণ-কোষ', যাতে স্নায়বিক সংস্পর্শ ও রূপায়ণ হয়; মানসিক,

'মনঃকোষ', যাতে সংস্পর্শ ও প্রতিচ্ছবি হয় মনোময়। আমরা মনোময় কোষে কেন্দ্রস্থ হয়ে কাজ করি বলে' আমাদের কাছে উপনীত হবার পূর্বে জড়জগতের সব অভিজ্ঞতাকে অপর দুটি কোষের মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

সুতরাং, সংস্পর্শই হল ইন্দ্রিয়বোধের ভিত্তি আর সার সংস্পর্শ হল মনোময়, নতুবা বোধ জন্মাবে না। যেমন, উদ্ভিদের অনুভব হয় স্নায়বিক—প্রাণশক্তির সংজ্ঞাতে—অবিকল মানুষের নাড়ীতন্ত্রের অনুভবের মত, আর প্রতিক্রিয়াও উভয়ক্ষেত্রে হয় অভিন্ন ; কিন্তু মনের বীজ যদি উদ্ভিদে থাকে তবেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই সব স্নায়বিক বা জৈব প্রতিরূপ বা প্রতিক্রিয়ার প্রতীতি তার হচ্ছে। তাহলেই তার অনুভব শুধু স্নায়বিক হবে না মনোময় উপাধিও তার থাকবে। তাহলে বলা যেতে পারে যে, মূলতঃ, ইন্দ্রিয়বোধ হল মনের দ্বারা কোন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ আর মনের উপর তার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ।

এখানে আমাদের জড়দেহাশ্রিত মনের সংজ্ঞা ধরে' সব তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিচার করা হল ; কারণ এসব কোষ স্থূল জড়ের আধারে প্রতিষ্ঠিত ক্রমসূক্ষ্মতর পদার্থে গঠিত। কল্পনা করা যাক যে, মনোময় লোক একটা আছে যেখানে আধার হল মন, জড় নয়। সেখানে বোধের প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ পৃথক। তা হবে মন দিয়ে মনের প্রতিচ্ছবির অনুভব ; অবশ্য, পরে সে-ছবি ক্রমশঃ স্থূলতর বস্তুতে রূপের আকারে নিক্ষিপ্ত হবে ; আর সে-লোকে যত পার্থিব বিগ্রহই আগে থেকে বর্তমান থাকুক না কেন সে-সব সত্বর মনের ডাকে সাড়া দেবে, নিজেকে বদলাবার সপক্ষে মনের ইঙ্গিত সব মেনে নেবে। সেখানে মনই হবে প্রতাপী, স্রষ্টিপর ও প্রবর্ত্তক প্রভু ; এখানে আমাদের মধ্যে সে যেমন জড়ের আদেশবহ ও শুদ্ধমাত্র বিম্বগ্রাহী, অথবা জড়ের সঙ্গে সংঘাতে রত এবং তামসিকতার বশে তার স্পর্শে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক, নির্দিষ্টবৃত্তি প্রতিকূল উপাদানকে

বহুলায়াসে কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে সক্ষম, সে অবস্থা সেখানে তার আদবেই নয়। তার উপরে যে অতিমানস শক্তিই থাকুক না কেন, তার শাসন সে মেনে নেবে বটে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সে হবে নমনীয় আশুগ্রাহী অনুকূল উপাদানের প্রভু। কিন্তু তথাপি, সংবেদন বর্তমান থাকবেই, কারণ মনোময় চেতনাতে বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং তার প্রতিরূপ-গঠন সত্তার স্বধর্মের অঙ্গ থাকবেই।

প্রকৃতপক্ষে, মন—বা সাধারণভাবে কর্মপ্রবৃত্ত চেতনা—যেখানে যেভাবেই কাজ করুক না কেন তার পক্ষে অপরিহার্য চারিটি অত্যাবশ্যক বৃত্তি আছে ; উপনিষদ তাদের 'বিজ্ঞান', 'প্রজ্ঞান,' 'সংজ্ঞান' ও 'আজ্ঞান' নামে উল্লেখ করেছে। 'বিজ্ঞান' হল আদিম সমগ্রবোধী চেতনা,—সব বস্তুর সারস্বরূপ, তাদের সাকল্য এবং সব অংশ, তাদের সব ধর্ম ও গুণ, সবের প্রতিরূপই সে ধারণ করে' আছে ; মৌলিক স্বতঃস্ফূর্ত যথাযথ ও সমগ্র হল তার সে রূপদর্শন ; প্রকৃতপক্ষে তা অতিমানসেরই বৈভব, সর্বদর্শী মনীষার শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিগুলিতে মন ক্বচিৎ তার আভাসমাত্র পায়। 'প্রজ্ঞান' হল যে-চেতনা বস্তুর প্রতিরূপ তার নিজের সম্মুখে বিষয়রূপে ধারণ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবে বলে' এবং প্রতিবোধ ও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের দ্বারা তাকে গ্রহণ করবে বলে'। 'সংজ্ঞান' হল বস্তুর প্রতিরূপের সঙ্গে যে-সংস্পর্শের দ্বারা চেতনা নিজের সত্তাতে অনুভবগম্যভাবে তাকে গ্রহণ করে। প্রজ্ঞানকে যদি বলা যায় বিষয়কে তার সচেতন শক্তিতে গ্রহণ করবার—অর্থাৎ তাকে জানবার—উদ্দেশ্যে প্রতিবোধী চেতনার বহির্গমন, তাহলে সংজ্ঞানকে বলতে হয় তার সম্মুখে অবস্থিত বিষয়কে আবার নিজের মধ্যে এনে তার সচেতন সত্তা দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার—অর্থাৎ তাকে অনুভব করবার—উদ্দেশ্যে প্রতিবোধী চেতনার অন্তরাবর্তন। 'আজ্ঞান' হল চেতনা যে-ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুর প্রতিরূপের উপর অধিষ্ঠান করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ও নিজের শক্তির

অধিকারে আনবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, এই চারিটিই হল সমস্ত সচেতন ক্রিয়ার ভিত্তি।

আমাদের মানব মনোবৃত্তির যা গঠন তাতে আমরা সংজ্ঞান থেকে বা প্রতিরূপের মধ্যে বিষয়ের বোধ থেকে আরম্ভ করি, জ্ঞানে তার প্রতিবোধ আসে পরে। তারপর আমরা চেষ্টা করি জ্ঞানে তাকে উপলব্ধি করতে এবং শক্তিতে তাকে অধিকার করতে। এসবের পূর্বে আমাদের অবচেতন ও অধিচেতন সত্তাতে আরও সব গোপন ক্রিয়া হয় কিন্তু আমাদের বহিশ্চর সত্তা সে সবের বিষয়ে অজ্ঞ সুতরাং আমাদের কাছে সে সবের কোন অস্তিত্ব নাই। সে সবের কথা জানতে পারলে আমাদের সজ্ঞান ক্রিয়াবৃত্তি সম্পূর্ণ বদলে যেত। বস্তুতঃ, প্রথম ঘটে একটা ত্বরিত ব্যাপার যার দ্বারা আমরা একটা প্রতিরূপ অনুভব করে' তার প্রতিবোধক প্রতীতি ও প্রত্যয় গড়ি, তার পরে আসে বুদ্ধির মন্থরতর ক্রিয়া যার দ্বারা আমরা তাকে উপলব্ধি ও অধিকার করতে চেষ্টা করি। প্রথমটি হল আমাদের মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া, আমাদের মধ্যে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে; দ্বিতীয়টি আমাদের অর্জিত, মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, সম্পূর্ণ সহজ এবং নিপুণভাবে যা করতে পারে শুধু মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বৃত্তি এ হল মনোময় সত্তার সেই কাজ করবার প্রয়াস। মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে সেতু করে' অতিমানসের সঙ্গে সজ্ঞানে সংযোগ স্থাপনের এবং দেহধারী জীবকে নিজের মধ্যে অতিমানস ক্রিয়ার উপযোগী করে' প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যে মনোময় সত্তার এই চেষ্টা চলেছে। সুতরাং, প্রথম ক্রিয়া হয় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, দ্রুত ও নির্দোষ আর দ্বিতীয়টি হয় মন্থর ও আয়াসবহুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের মনীষা তার ক্রিয়াতে ঈষদঙ্কুরিত অতিমানস ক্রিয়ার সহযোগ ও শাসন যত মেনে নেয়—আর তাতেই হয় প্রতিভার সৃষ্টি—এই দ্বিতীয় ক্রিয়াটিও হয় তত বেশী সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, দ্রুত ও নির্দোষ।

মনোলোকের দেবতারা নিজেদের কীর্তি বলে' যা-সব গণনা করেন অন্তরাল থেকে সে-সবের পরিচালক, বিশ্বের অধ্যক্ষ এক পরমচেতনার অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা যায়, তাহলে সে-চেতনাকে অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রভু হতে হবে। তার ক্রিয়ার বা বিশ্বশাসনের মূল ভিত্তি হবে মৌলিক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বগ্রাহী বিজ্ঞান ও আজ্ঞান। সে তার সচেতন জ্ঞানের বলে সমস্ত বস্তু উপলব্ধি করবে, তার সচেতন শক্তির বলে সমস্ত শাসন করবে। এ-সব শক্তিই হবে নিখিল সাকার বিশ্বের যিনি স্রষ্টা ও স্বামী, তাঁরই চিন্ময় সত্তার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। তাহলে প্রতিবোধী চেতনা ও সংবোধের জন্য কি কাজ অবশিষ্ট থাকবে? স্বতন্ত্র বৃত্তিরূপে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না, সর্বগ্রাহী চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে তারই গৌণবৃত্তিরূপে তারা প্রচ্ছন্ন থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, এ চারিটি বৃত্তির মিলনে হবে একটা অখণ্ড দ্রুত ক্রিয়া। আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞান ও সংজ্ঞান যত দ্রুত কাজ করে সেই বেগে যদি এই চারিটি ক্রিয়াই একযোগে সাধিত হতে পারত তাহলে আমাদের কালের সংজ্ঞাতে পরাশক্তির পরমক্রিয়ার অনবচ্ছিন্ন একত্বের, অপর্যাপ্ত হলেও, কথঞ্চিৎ ধারণা আমরা করতে পারতাম।

বিবেচনা করলে বুঝতে পারব যে, তা হতেই হবে। পরাচেতনাকে আত্ম-অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর প্রতিরূপ তার চিন্ময় সত্তার সমগ্রবোধে ধারণ করতে ত হবেই, আবার প্রতিবোধী চেতনার বৃত্তি দুটি দিয়ে তাঁর নিজের সত্তার সম্মুখে—অবশ্য, সর্বদাই তাঁর সত্তার মধ্যে, বাহিরে নয়,—তাদের ধারণ করে' তাদের সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতেও হবে। নতুবা, আমাদের কাছে যেরূপে বিশ্ব প্রতিভাত হয় সে-রূপ তার থাকতে পারত না; কারণ, আমরা আমাদের সংজ্ঞার দর্পণে শুধু পরাশক্তিরই সব ব্যাপার প্রতিফলিত করি। কিন্তু, সেখানে প্রতিবোধের সম্মুখে বস্তুর প্রতিরূপ বিধৃত হয়েছে সমগ্রবোধী

ইন্দ্রিয় বোধের স্বরূপ

সত্তার অভ্যন্তরে, আমাদের ব্যষ্টি মনের মত, বাহ্যবস্তুর আকারে নয়; আর এই ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্যই সে পরম মন এবং পরম সংবোধ হবে আমাদের মনোবৃত্তি ও সংবেদনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপের। সমগ্রজ্ঞান ও পূর্ণস্বারাজ্যের অভিব্যক্তি হবে সে সব, জ্ঞানান্বেষী ও গ্রহণপ্রয়াসী অজ্ঞান ও অসামর্থ্যের নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সারস্বরূপ ও সামান্যবৃত্তি অবশ্য সেই সংবোধের প্রতিফলন ও সৃষ্টি। কিন্তু এ উপনিষদে তাকে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়বোধের পশ্চাতে সংবোধ না বলে' বিশেষ করে', চক্ষুর পশ্চাতে চক্ষু ও শ্রোত্রের পশ্চাতে শ্রোত্র বলা হয়েছে। অবশ্য, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম বলে চক্ষুকর্ণকে ইন্দ্রিয়ের প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে। তবু বোঝা যায় যে, এ উপনিদের মতে আমাদের অন্তঃকরণের অঙ্গীভূত পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের অনুরূপ কোন না কোন বিভেদ পরম সংবোধেও আছে। কি করে' তা সম্ভব হয়? এখন এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, সেজন্য আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎপত্তি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করতে হবে এবং শুদ্ধমাত্র দেহে বা প্রাণশক্তিতে তাদের বাস্তব প্রকাশের রূপে আবদ্ধ না থেকে আমাদের অন্তঃকরণে তাদের কি উৎস তাও বিচার করতে হবে। কি আছে মনের মধ্যে যা দর্শন ও শ্রবণের মূল কারণ? কেন আমরা দেখি বা শুনি, কেন শুদ্ধমাত্র মন দিয়ে বোধ গ্রহণ করি না?

৯

মন ও ইন্দ্রিয়

ভারতের মনস্তত্ত্ববিদেরা মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলেছেন, আর তাকেই প্রধান ইন্দ্রিয়ের আসন দিয়েছেন। প্রাচীন বিধানে ছিল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন উভয়াত্মক, একাধারে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ কর্মেন্দ্রিয়। মনস্তত্ত্বের এ একটা সহজ কথা যে, মনের সহযোগ ছাড়া কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজই সিদ্ধ হয় না; চোখ দেখতে পারে, কান শুনতে পারে, সব ইন্দ্রিয়ই তার কাজ করে' যেতে পারে কিন্তু মন তাতে যুক্ত না হলে মানুষের দেখা, শোনা, ছোঁওয়া, স্বাদ নেওয়া কিছুই হয় না। তেমনি, মনস্তত্ত্ব অনুসারে, কর্মেন্দ্রিয়ের কাজ হয় মনের ইচ্ছাশক্তিরূপে ক্রিয়ার বলে অথবা, শারীর বিধানের ভাষায়, অভিঘাতের প্রতিক্রিয়াতে মস্তিষ্ক থেকে যে স্নায়বিক শক্তি প্রসৃত হয় তার বলে; আর বস্তুতান্ত্রিকের ধারণাতে সব ইচ্ছাশক্তিরই সেই সারস্বরূপ ও প্রকৃতি। সে যাই হক, দশ ইন্দ্রিয়ই, আর দশের বেশী হ'লে,—উপনিষদের একটি বাক্য* অনুসারে অন্যূন সপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সপ্ত কর্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় থাকা উচিত,—সব ইন্দ্রিয়ই হল মানস-চেতনারই ক্রিয়ার ব্যবস্থা, ব্যাপার বা করণ, আর সজীব জড়ের আধারে ক্রমবিবর্তনের প্রয়োজনে মনই এই সব কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

বর্তমান মনোবিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি করে' একটা সত্য আমাদের শিখিয়েছে যা আমাদের প্রাচীন মনীষীরা জানতেন কিন্তু

---

* মুণ্ডক ২।১।৮

অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা এ সত্য এখন জানি বা পুনরাবিষ্কার করেছি যে, মনের সজ্ঞান ক্রিয়া একটা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর সমর্থতর অবচেতন বা অন্তশ্চর মন রয়েছে ইন্দ্রিয়েরা যা আনে তার কিছুই সে হারায় না, সে সমস্ত সম্পদ সে তার অক্ষয় স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখে—'অক্ষিতং শ্রবঃ'। বহিশ্চর মন হয়তঃ অবধান করে না কিন্তু অন্তশ্চর মন সব অবধান করে, গ্রহণ করে, কোন ভ্রমপ্রমাদ না করে' সব ধারণ করে' রাখে। বর্ণজ্ঞানহীন দাসী তার প্রভুকে প্রত্যহ পাঠাগারে হিব্রুভাষায় আবৃত্তি করতে শোনে। বহিশ্চর মন সে অবোধ্য প্রলাপে কান দেয় না কিন্তু তার অন্তশ্চর মন শোনে, স্মরণ করে রাখে এবং অস্বভাবী অবস্থাতে যখন তা বেরিয়ে আসে তখন সে আবৃত্তি এমন ভ্রমপ্রমাদহীন ও বিদ্বজ্জনোচিত হয় যে পরম মেধাবী ছাত্রেরও তাতে ঈর্ষা হতে পারে। ব্যক্তপুরুষ বা মন শোনেনি কান দেয়নি বলে'; কিন্তু অন্তরের বৃহত্তর পুরুষ বা মন সব শুনেছে কারণ সে তার অসীম সামর্থ্য নিয়ে সর্বদাই অবধান করে—বরং বলা যেতে পারে, 'অনুধান' করে বা পশ্চাতে অবস্থান করে' গ্রহণ করে। তেমনি আবার কাউকে নিঃসাড় করে' তার উপর অস্ত্রোপচার করা হলে সে কোনও বেদনা অনুভব করে না বটে কিন্তু সংবেশন বা সম্মোহের অবস্থাতে তার অন্তশ্চর মন মুক্ত হ'লে সে অস্ত্রোপচারের ব্যাপার ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা সব সে সবিস্তারে যথাযথভাবে বর্ণনা করবে; কারণ শারীর ইন্দ্রিয়ের বিমূঢ়ভাবের জন্য আভ্যন্তরীণ বৃহত্তর মনের অবেক্ষণে বা অনুভবে কোন বাধা হয় নি।

তেমনি আবার, আমরা জানি যে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার বহু-লাংশই সাধিত হয় সহজাত সংস্কারের দ্বারা; বহিশ্চর মন তাদের নিয়-ন্ত্রণ করে না, করে অবচেতন অন্তশ্চর মন। আর, আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, এ সব একটা মনেরই কাজ, পশুসুলভ শারীর মস্তিষ্ক

থেকে প্রসূত স্নায়বিক ক্রিয়া মাত্র নয়। যে-সব শুয়ো পোকা বা গুবরে পোকা চলচ্ছক্তিহীন করে', কুমরে পোকা তার বাসায় ডিমের সঙ্গে জীবন্তে বন্ধ করে' শিশুকীট গুলির জন্মাবার পর টাট্‌কা আমিষাহারের নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখে, সে-সবের শারীর সংস্থান তার অন্তশ্চর মন ঠিক জানে; তাই তার বহিশ্চর মনের দ্বিধাখণ্ডিত অনিশ্চিত স্নায়বিক ক্রিয়া যদি পথরোধ করে' তার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিকে ব্যাহত না করে তাহলে নিপুণতম শল্যবিদের মত সে নির্ভুল ভাবে ঠিক জায়গায় তার হুল ফুটিয়ে দেবে!

বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামির নামে, অতীত অজ্ঞানের সব বাধা আজিও কাটিয়ে উঠতে পারে নি বলে' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান যে-সত্য এখনও উপেক্ষা বা অস্বীকার করছে তার নির্দেশ পাই এই সব তথ্য থেকে। উপনিষদে স্পষ্ট বলেছে যে, আমাদের মধ্যে মন অসীম; শুধু দৃষ্ট নয় অদৃষ্ট বিষয়ও সে জানে, শ্রুত অশ্রুত, মননের দ্বারা নির্ধারিত বা অনি-র্ধারিত সবই সে জানে। তাহলে, আজকালকার জ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যে বহিঃসংজ্ঞ মানব তার পার্থিব অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমাবদ্ধ—সে জানে শুধু তার দেহস্থিত স্নায়ুচারী প্রাণ তার দেহ-ধারী মনের কাছে যা উপস্থাপিত করে, এই সব স্নায়ুবাহিত সংবাদের মধ্যেও আবার সে জানে ও ধারণ করে' ব্যবহার করতে পারে শুধু তত-টুকুই যা তার বহিশ্চর মানসেন্দ্রিয় অবধান করে' সজ্ঞানে স্মরণে রেখেছে; কিন্তু তার অন্তরে এক বৃহত্তর অন্তশ্চেতনা রয়েছে যা সে সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। বহিশ্চর মন ও ইন্দ্রিয় যা বোধ করেনি সে অন্তশ্চেতনা তা বোধ করে, বহিশ্চর মন যা মননের দ্বারা অর্জন করে' শিক্ষা করেনি তা সে জানে। কীটের অন্তশ্চেতনা তার শীকারের শারীর সংস্থান জানে; বাহ্যতঃ নিঃসাড় ব্যক্তির অন্তশ্চেতনা শল্যবিদের শল্যের গতি-বিধি অনুভব করে' স্মরণে ত রাখেই, ঔষধের প্রভাবে বোধহীন ছিল

বলে' তার স্থূল দেহের কাছে যা আসতে পারেনি অস্ত্রোপচারের সে-সব আনুষঙ্গিক যন্ত্রণাও যথাযথ অনুভব করে; বর্ণজ্ঞানহীন দাসীর অন্তশ্চেতনা অপরিচিত ভাষা শুনে ঠিক স্মরণ করে' রেখেছিল আর, যোগের অভিজ্ঞতাতে জানা যায় যে, নিজেরই মহত্তর ক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যতঃ অবোধ্য সে সব শব্দের অর্থবোধ করতেও পেরেছিল।

বেদান্তের যে পরিভাষা আমরা ব্যবহার করছিলাম তাতে বলতে হয় যে, সংজ্ঞানের একটা বৃহত্তর ক্রিয়া আছে যা শারীর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, আর সে চেতনাই এ সব বোধ গ্রহণ করেছে: নিজের কানে শুনে অপরিচিত ভাষার শব্দ আয়ত্ত করেছে, নিজের স্পর্শ থেকে অস্ত্রোপচারের অননভূত গতি বোধ করেছে, নিজের মানসেন্দ্রিয় বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে গুবরে পোকার চলচ্ছক্তির স্নায়বিক কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান জেনেছে। তার সহযোগিতা করেছে বাহ্য মনের ক্ষুদ্রতর গ্রহণ-ধারণের সীমা থেকে মুক্ত, প্রজ্ঞান আজ্ঞান ও বিজ্ঞানের তদনুরূপ বৃহত্তর ক্রিয়া। সব শব্দের যথাযথ অন্যোন্যসম্বন্ধ, শল্যের গতির সঙ্গে স্নায়ুর অননুভূত বেদনার সম্বন্ধ, ঝিল্লী দেহের পর্বসন্নিবেশে অবস্থানপারম্পর্যের সম্বন্ধ—সবই এই প্রশস্ততর প্রজ্ঞানই প্রত্যক্ষ করেছে। শব্দের নির্ভুল পুন-রাবৃত্তি, যন্ত্রণার যথাযথ বর্ণনা, সঠিক অনুক্রমে হুল ফোটান—এ সবের মধ্যেই এ প্রত্যক্ষজ্ঞান অন্তর্নিহিত ছিল। এ সব ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে বৃহত্তর আজ্ঞান বা জ্ঞানময় সংকল্প থেকে, বহিশ্চর মনের দ্বারা চালিত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে যে দ্বিধাখণ্ডিত শক্তি তার দ্বারা তা সীমাবদ্ধ নয়। আর, এ-সব উদাহরণে বৃহত্তর বিজ্ঞানের ক্রিয়া যদিও তেমন সুস্পষ্ট নয়, তবুও তা অবশ্যই ছিল এবং এ-সবের মধ্যে কাজ করে' তাদের সুসঙ্গত সন্নিবেশের ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য হল সংজ্ঞান। সর্বাগ্রে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, ইন্দ্রিয়গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ

একটা ক্রিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মানসের আছে, যা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে প্রতি-বিম্বিত না করে'ও বিষয়কে জানতে পারে কিন্তু, কতকটা যেন গৌণ ক্রিয়ারূপেই—তবে গৌণ হ'লেও অনুভবকে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করবার জন্য তা প্রয়োজনীয়—সেই সব তন্মাত্রবোধে তাকে প্রতি-বিম্বিত করে। জড়াতীত চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারে তা বেশ পরিষ্কার হয়। এ বিষয়ে যাঁরা কিছু অধ্যয়ন বা পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই দেখে-ছেন যে, অপরের জ্ঞাত বিষয়, বহুদূরস্থিত পদার্থ কিংবা জড়াতীত ভূমিতে অবস্থিত কিন্তু ইহলোকে ফলপ্রসূ সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি ; শব্দাদি প্রতিবিম্বরূপে তাদের বোধ করতে পারি, আবার যেন পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন নির্দিষ্ট প্রতিবিম্ব ছাড়াও তাদের স্বরূপ সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি।

প্রথমতঃ, এতে প্রমাণ হয় যে, চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় কেবলমাত্র পার্থিব ক্রমবিবর্তনের ধারাতে আমাদের শারীর ইন্দ্রিয়স্থানের পরিণতির ফল নয়। সব জড়ভূতের মধ্যে অবস্থিত অন্তশ্চর মন, জড়ে নিজের ক্রমবিবর্তনের ধারাতে, এই সব শারীর ইন্দ্রিয়ের পরিণতি সাধন করেছে—পার্থিব ক্ষেত্রে, পার্থিব জীবনে, পার্থিব উপায়ে, শ্রবণদর্শনাদি মনের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে ; কিন্তু এসব মনেরই স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, পার্থিব ক্রমবিবর্তনের অবস্থার উপর সে সব নির্ভর করে না এবং শারীর চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-ত্বক ব্যবহার না করেও সে-সব প্রয়োগ করা সম্ভবপর। যদি চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য ধরে' নেওয়া হয় যে, চৈত্য ইন্দ্রিয় আছে আর তা চৈত্য দেহে কাজ করে, তাহলেও সে-ক্রিয়া মৌলিক সংবোধের, বা সংজ্ঞানের, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ারই একটা বিশেষ ব্যবস্থা ; কিন্তু সে সংজ্ঞান নিজে কোন শারীর ইন্দ্রিয়স্থান ছাড়াও কাজ করতে পারে। এই মৌলিক সংবোধ হল চেতনার আত্মানুভবেরই আদিম বিভূতি : নিজের সৃষ্ট সব

সাকার পদার্থকে নিজের মধ্যে, আর নিজেকে সব সাকার পদার্থের মূল ধর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে, অনুভব করবার ক্ষমতা সে চেতনার আছে—তা সে অনুভব জড়ীয় শব্দস্পন্দ বা আলোকবিম্ব অথবা অপর কোন স্থূল প্রতীকের দ্বারা প্রতিরূপিত হ'ক বা না হ'ক।

জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি যে, বর্ণ-জ্যোতিঃ প্রভৃতি সাকার পদার্থের বাহ্যতম গুণগুলিই মাত্র শক্তির ক্রিয়া নয়, এমন কি আকারও শক্তিরই একটা ক্রিয়া। সে শক্তিও ত আবার কর্মপ্রবৃত্তি ও প্রৈতির অবস্থাতে চিন্ময় সত্তারই শক্তি।* সুতরাং, কার্যতঃ চেতনা নিজের কাজ নিজের সামনে ধরাতে তার নিজের উপর যে ছাপ পড়ে সেই হল আকার। আমরা রং দেখি, কারণ চেতনার একটা ক্রিয়া বর্ণরূপে তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয়; কিন্তু রং ত আলোকরূপে ক্রিয়মাণ শক্তিরই ফল, আবার আলোক ত একটা গতিমাত্র—অর্থাৎ শক্তিরই একটা ক্রিয়া। তাহলে প্রশ্ন হল যে, শক্তির যে-ক্রিয়া আকাররূপে তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয় তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কি? কারণ, সংজ্ঞান বা মৌলিকসংবোধ যে ভূমিতেই কাজ করুক না কেন, তার ক্রিয়ার ধারা তার দ্বারাই নির্ণীত হবে।

সব জিনিষের প্রারম্ভে রয়েছে স্পন্দন বা সঞ্চলন, আদিম 'ক্ষোভ' বা বিলোড়ন। চিন্ময় সত্তার কোন সঞ্চলন না থাকলে তিনি শুধু তাঁর স্থাণু অস্তিত্বই জানতে পারেন। চেতনাতে সত্তার স্পন্দন† বা

---

* দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং, নিজের গুণের দ্বারা উপহিত ভাগবত সত্তার আত্মশক্তি। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১।৩)

† এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত বলে নয়,—আধিভৌতিক কোন সংজ্ঞাই তা হতে পারে না,—নিজের সন্ধানে চেতনার প্রথম নিঃসরণের আভাস এই শব্দে সব চেয়ে বেশী আসে বলে'।

সঞ্চলন ছাড়া জ্ঞানের কোন ক্রিয়া হতে পারে না, সুতরাং সংবোধও থাকতে পারে না ; আবার শক্তিতে সত্তার স্পন্দন বা সঞ্চলন ছাড়া সংবোধের কোন বিষয়ও থাকতে পারে না। চিন্ময় সত্তার জ্ঞানরূপে সঞ্চলন নিজেকে শক্তির সঞ্চলনরূপে অবগত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান নিজের কর্ম-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে পৃথক করে' সে-কর্মকে সাক্ষীরূপে দেখে এবং অনুভবের দ্বারা আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, এই হল সার্বজনীন সংজ্ঞানের মূল। আমাদের বাহ্য ও আন্তর উভয়বিধ ক্রিয়ার পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য। আমি ক্রোধে পরিণত হই সচেতন শক্তির স্নায়বিক ভাবোচ্ছ্বাসরূপ স্পন্দনের প্রভাবে ; আবার আমি পরিণত হয়েছি যে-ক্রোধে তাকে অনুভব করি সেই শক্তিরই জ্ঞানের আলোকরূপে অন্যতর ক্রিয়ার প্রভাবে। আমার দেহবোধ আছে কারণ আমি নিজেই সে-দেহ হয়েছি ; চিন্ময় সত্তার যে-শক্তি নিজের এই মূর্তি নির্মাণ করেছে—অর্থাৎ যে-শক্তি তার ক্রিয়া নিজের কাছে এই আকারে উপস্থাপিত করেছে—সেই শক্তিই তাকে এই মূর্তিতে, এই আকারে জানে। আমি নিজে যা, তা ছাড়া কিছুই আমি জানতে পারি না ; অপরকে যে জানি তার কারণ তারাও আমি নিজেই,—আমার নিজের চিৎকেন্দ্রের নিকটতম সব অভিব্যক্তির মতনই সমানভাবে আমার সত্তাই, আপাতদৃষ্টিতে অনাত্ম, এইসব রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং বাহ্যই হ'ক আন্তরই হ'ক, দৈহিকই হ'ক চেতসিকই হ'ক, সব সংবেদনই, সংবোধের সব ক্রিয়াই, স্বরূপতঃ অভিন্ন।

কিন্তু চিন্ময় সত্তার এই স্পন্দন তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়বোধের যে-সব বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় সে-সবই হল তাঁর মূর্তিগ্রহণক্রমের সোপান পরম্পরার অনুযায়ী। কারণ, বিস্বষ্টিতে প্রথম হয় স্পন্দনের তীব্রতা যাতে সুনিয়ত ছন্দের সৃষ্টি হয়, বিশ্বস্বষ্টিতে রূপনির্মাণের যা হল মূলভিত্তি বা উপাদান ; দ্বিতীয়তঃ হয় চিন্ময় সত্তার সেই ছন্দোময় গতিপ্রবাহের

সংযোগ ও অন্যোন্যসংমিশ্রণ; তৃতীয়তঃ হয় সংযুক্ত সেই শক্তিপ্রবাহের সব বিভিন্ন গুচ্ছের রূপরেখা নিরূপণ—তাদের আকার ; চতুর্থতঃ হয় এই নির্দিষ্টাকার প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনমত শক্তির অবিরাম উৎসারণ ; পঞ্চমতঃ হয় গতিপ্রবাহের নির্ধারিত আকারপোষণের জন্য শক্তির সেই ক্রিয়াতেই শক্তির ব্যবহারিক সংরোধ বা সংহতি। সাংখ্যেরা বলেন যে, জড়পদার্থ সংগঠনের এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াই পঞ্চভূতরূপে বা—আকাশ, বায়বীয়, তৈজস, তরল ও ঘন—পদার্থের এই পঞ্চ অবস্থারূপে প্রতিভাত হয়। আর, স্পন্দনের ছন্দকে তাঁরা বলেন 'শব্দ' বা ধ্বনি—শ্রবণের ভিত্তি,অন্যোন্য সঙ্গমকে বলেন সন্নিকর্ষ—স্পর্শের ভিত্তি,আকার নির্ধারণকে বলেন রূপ—দর্শনের ভিত্তি, শক্তির উৎসারণধারাকে বলেন 'রস' বা দ্রব—আস্বাদনের ভিত্তি, ঘনীভূত অণুর বিকিরণকে বলেন 'গন্ধ'—ঘ্রাণের ভিত্তি। একথা অবশ্য বিশুদ্ধ বা সূক্ষ্ম জড় সম্বন্ধেই বলা হয়েছে ; আমাদের জগতে পার্থিব জড়পদার্থ ত শক্তির বিমিশ্র ক্রিয়া, তাতে এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার বা পঞ্চভূতের কোনটিকেই, বেশ বিকৃত ভাবে ছাড়া, বিবিক্তরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সবই ত স্থূল ক্রিয়া বা প্রতীকের উদাহরণ মাত্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বরূপতঃ সব রূপায়ণই—এমনকি মনের রূপ, চরিত্রের রূপ বা আত্মার রূপের মতন সবচেয়ে সূক্ষ্ম, সব চেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় পর্যন্তও—কর্মপ্রবৃত্ত চিৎ-শক্তির এই পঞ্চপর্বক্রিয়া।

সুতরাং, সংজ্ঞানের বা মৌলিক সংবোধের অবশ্যই এই সবরকমের ক্রিয়াই গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে, তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রণালীতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের জ্ঞানে একত্ব সাধন করে' এর সব কটিকেই নিজের অঙ্গীভূত করে' নিতে সে অবশ্যই সক্ষম। রূপের সমগ্র মর্ম বিধৃত রয়েছে যে-সব স্পন্দনে সে-সবের তীব্রতার বা ছন্দের তার যে-বোধ তা-ই মৌলিক শ্রবণের ভিত্তি আর তারই বাহ্যতম ফল হল আমাদের পার্থিব শব্দ বা

কথিত বাক্যের প্রতিবোধ। তেমনি আবার, চিন্ময় শক্তির অন্যোন্য-সংযোগ ও সংমিশ্রণের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক স্পর্শের ভিত্তি; শক্তির রূপরেখা বা আকারের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক দর্শনের ভিত্তি; আর, সত্তার আত্মানন্দের যা রহস্য, সেই রূপের মধ্যে সার সত্তার উৎসারণের তার যে বোধ তাই হল মৌলিক স্বাদের ভিত্তি; শক্তির আকুঞ্চনের এবং সত্তার বস্তুর স্বতঃক্ষরণের তার যা বোধ তাই হল মৌলিক প্রাণন বা নিঃশ্বসনের ভিত্তি—স্থূলভাবে পার্থিব পদার্থে যা গন্ধরূপে প্রতিভাত হয়। যে-কোন লোকে, যে-কোন সাকার পদার্থ আশ্রয় করে' মৌলিক সংবোধের এই সব সার বৃত্তি কাজ করে' যাবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের উপযোগী আয়তন বা সন্নিবেশ সন্ধান করবে, নিজেদের ক্রিয়া সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে' নেবে।

সহজেই বোঝা যায় যে, ঊর্ধ্বতম চেতনাতে এই বহুমুখী সংবোধ যৌগিক একত্বে অভিন্ন হয়ে থাকবে,—ঠিক যেমন দেখেছি যে, সেখানে জ্ঞানের বহুবিধ ক্রিয়াও যৌগিক একত্বে সম্মিলিত থাকে। এমন কি, আমরা যদি কোন শারীর ইন্দ্রিয় বিচার করি,—যেমন শ্রবণ,—যদি যত্ন করে' লক্ষ্য করি যে, অন্তরস্থ মন কি করে' তাদের কাজ গ্রহণ করে, তাহলে দেখব যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কাজের মধ্যেই অন্য সব ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও সূক্ষ্মভাবে বর্তমান আছে। আমরা যাকে শব্দ বলি সে মন যে শুধু সেই স্পন্দনই অবগত আছে তা নয়, শব্দে যে শক্তি আছে আর আমাদের অন্তরের যে স্নায়বিক শক্তির সঙ্গে তা মিশ্রিত হয়—এই দুই শক্তির সঙ্গম ও আদানপ্রদানও সে অবগত আছে; শব্দের রূপরেখা বা আকার এবং যে-সব জটিল সম্বন্ধ ও সংযোগ দিয়ে শব্দ গঠিত হয় তাও সে অবগত আছে; শব্দের যা মূল বা যে উৎসারিণী চিৎশক্তি শব্দের উপাদান এবং যা শব্দের অনবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে' আমাদের স্নায়বিক সত্তাতে

তার স্পন্দন দীর্ঘতর করে, সে মন তাকেও অবগত আছে ; শক্তির আকুঞ্চন থেকে নিঃসৃত যে অণু স্পন্দপ্রবাহ যেন শব্দের সংহতি সৃষ্টি করে, আমাদের স্নায়ুর দ্বারা নিঃশ্বাসের মত যাকে আমরা আমাদের অন্তরে আকর্ষণ করি সে মন তাও অবগত আছে। শক্তির এই ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ পার্থিব রূপ হল সঙ্গীত ; আর এই সব সংবেদনই সঙ্গীতের দরদ বা সূক্ষ্ম রসানুভবের ও আনন্দের অঙ্গীভূত—এই সব নিয়েই গড়ে ওঠে সঙ্গীতে আমাদের শারীরিক রসবেদন ও স্নায়বিক সত্তার আনন্দ ; এর যে-কোন একটার ন্যূনতা হলেই সেই পরিমাণে আমাদের আনন্দ ও রসবেদন কমে যাবে। পার্থিব চেতনার ঊর্ধ্বে এই যৌগিক একত্ব অবশ্যই আরও অনেক বেশী আর ঊর্ধ্বতম চেতনাতে নিশ্চয়ই সে আনন্দ সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তা ছাড়াও মূল সংবোধ অবশ্যই কর্মপ্রবৃত্ত সমগ্র চিন্ময় সত্তার নিগূঢ় সারস্বরূপের বোধ গ্রহণ করতে পারে—তাঁর স্ব-রূপে, শুধু তাঁর ক্রিয়ার অভিব্যক্ত ফল থেকে নয় ; এবং সংবোধ যে চিৎ-সত্তার ক্রিয়ার ফল যথাযথভাবে অবধারণ করতে পারে তাও সে প্রতিভাসের পশ্চাতে সদ্বস্তুর এই গভীরতর সাক্ষাৎ অনুভবেরই পরিণাম বই নয়।

এই রকমে, আমাদের অন্তরের গভীরতম সত্যের আলোকে এ সবের বিচার করলে এবং বাহ্য প্রতিভাসের আবরণ ভেদ করে' তাদের পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এই ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়ের—প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ের, চক্ষুর চক্ষুর, শ্রবণের শ্রবণের—একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা করতে পারব। আত্মসমাহিত পরম নির্বিকল্প ব্রহ্ম-চেতনার কথা এই উপনিষদে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে সবিকল্পের উপর সেই নির্বিকল্পের দৃষ্টিপাতের কথা—সেই দ্রষ্টা ভাবই মহেশ্বর ও বিশ্বপ্রভু, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বশাস্তা, সর্বাতিগ ও সর্বময় ; আমাদের সত্তার বিভিন্নভূমিতে দেবতাদের সব ক্রিয়ার তিনিই বিধাতা, তিনিই নিয়ন্তা।

তিনিই সবের বিধাতা, তাই আমাদের কোন কাজ বা কোন বৃত্তি তাঁর সৃষ্টিপ্রবৃত্ত দৃষ্টিপাতের মূল প্রকৃতির অঙ্গীভূত কোন না কোন বিভাবের শারীরিক বা চেতসিক পরিণাম বা প্রতিরূপ বই আর কিছু হতে পারে না—আমাদের ইন্দ্রিয় সে দিব্য সংবোধের এবং আমাদের দর্শন-শ্রবণ সে দিব্য দশন-শ্রবণের ছায়া বই নয়। আর সে দিব্য দর্শন-শ্রবণ শুধু পার্থিব পদার্থেই সীমাবদ্ধ নয়, তার গোচরের প্রসার অনেক বেশী, চিন্ময় সত্তার সব রূপ ও সব ক্রিয়াই তা গ্রহণ করতে সক্ষম।

পরাচেতনাকে নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ দর্শন-শ্রবণের জন্য আমরা যাকে দর্শন-শ্রবণ বলি তার উপর নির্ভর করতে হয় না। তার কাজ হয় সৃষ্টিপর সর্বগ্রাহী পরম সংবোধের দ্বারা, আমাদের শারীরিক দর্শন-শ্রবণ তারই বাহ্য পরিণাম ও আংশিক ক্রিয়া। তবে, এ সবের কিছুই তার অজ্ঞাত বা পরিত্যক্ত নয়, কারণ সে-চেতনা সবের বিধাতা ও প্রেরয়িতা সুতরাং সর্বজ্ঞ; কিন্তু সে জ্ঞান হয় 'পরং ধাম', উর্ধ্বতম লোক থেকে, সবই যার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত; কারণ তার আদিম ক্রিয়াই বেদের ভাষায় হল বিষ্ণুর সেই উর্ধ্বতম প্রক্রমণ যাকে ঋষিরা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুরূপে দর্শন করেন, 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং'।* তার দ্বারাই জীব তার দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য দেখে শোনে; কিন্তু সব ইন্দ্রিয়ই তার প্রকৃত উপযোগিতা লাভ করে, তাদের পরম স্বভাব ও অমর সত্তাতে উপনীত হয় শুধু যখন আমরা বাহ্য শারীর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অনুসন্ধান থেকে বিরত হয়ে, এমন কি চেতসিক সত্তাকেও অতিক্রম করে' এই অধ্যাত্ম বা স্বরূপ সত্তার দিকে ফিরি, যিনি অপর সবের উদ্ভব ও উৎস, জ্ঞাতা বিধাতা ও সাক্ষী, যিনি সবের উপাদান, যিনি সবের প্রকৃত মর্যাদা অবধারণ করেন।

আমাদের অন্তরের এই নিগূঢ় ও অতিচেতন আধ্যাত্মিক বিষয়-

* ঋগ্বেদ, ১।২২।২০

মন ও ইন্দ্রিয়

সংবোধ থেকেই আসে শারীরিক ও চেতসিক সব ইন্দ্রিয়বোধের প্রকৃত সত্তা, তাৎপর্য এবং বাস্তবত্ব, নতুবা তাদের নিজস্ব এসব কিছুই নাই। তাতে উপনীত হলে' এই সব নিকৃষ্টতর ক্রিয়াবৃত্তি উন্নীত হয়ে তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সমগ্র জগতের এবং বিশ্বের সব বস্তুর বোধই পরিবর্তিত হয়ে অন্যতর জড়াতীত তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। অন্তর্যামী ঐশী চেতনাই আমাদের সব সংবেদন অনুভব করেন, আমাদের দৃষ্ট-শ্রুত সব দেখেন শোনেন ; কিন্তু তাতে আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ বা বাসনা তৃপ্তির উদ্দেশ্য আর থাকে না, আদি-অন্ত-হীন, নিজের অমৃতত্বের গুণে শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ পরানন্দের আলিঙ্গনে তিনি সব বেঁধে দেন।

১০

প্রাণের প্রাণ

প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৮

কিন্তু ব্রহ্মচেতনা ত শুধু আমাদের মনের মন, বাক্যের বাক্, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় নয়, আমাদের প্রাণেরও তা প্রাণ। অর্থাৎ, তা অস্তিত্বের পরম সার্বজনীন শক্তি এবং আমাদের দৈহিক জীবন ও যে-শক্তি তাকে পোষণ করে উভয়ই তার অবর পরিণাম, পার্থিব প্রতীক, বাহ্য সঙ্কুচিত ক্রিয়া। আমাদের অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়াবৃত্তি যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর জীবন বা কার্য্যের জন্য এসব অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না ; বরং সে-সবের তিনিই উর্ধ্বস্থ কারণ, সে-সব সেই প্রাণাতীত তত্ত্ব থেকেই রূপ নিয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

ইংরাজী life কথাটা অল্পবিস্তর বহু অর্থভেদে ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু উপনিষদে ও যোগের ভাষায় সুপরিচিত 'প্রাণ' শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ হল প্রাণশক্তি—হয় স্বরূপতঃ, না হয় তার ক্রিয়াবৃত্তি থেকে অনুমিত। 'প্রাণ' শব্দের লৌকিক অর্থ অবশ্য দৈহিক শ্বাস প্রশ্বাসই ছিল, সুতরাং অতি-সাধারণ ও স্থূল অর্থে তাতে জীবন বা প্রাণবায়ুই বোঝাত ; কিন্তু উপনিষদে ব্যবহৃত প্রাণ শব্দের তাত্ত্বিক তাৎপর্য তা নয়। উপনিষদের 'প্রাণ' হল স্বয়ং জীবনীশক্তি ; মেনে নেওয়া হত যে, পঞ্চধারায় সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়ে সে তার কাজ করে যাচ্ছে ; তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে' নাম দেওয়া হয়েছে, দৈহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তার প্রত্যেকটিই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই অবশ্যপ্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে

প্রাণের প্রাণ

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণশক্তির প্রধানতম—পাঁচটির মধ্যে প্রথম—প্রবাহের একটি ক্রিয়া মাত্র, স্বাভাবিক অবস্থাতে দেহের আধারে জীবনীশক্তিকে পোষণ ও পরিবেশন করতে সেই শক্তিই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ; কিন্তু তাকেও স্তম্ভন করা চলে আর তাতে জীবন যে নষ্ট হবেই তা নয়।

জৈব তেজ বা প্রাণশক্তির অস্তিত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করে না, কারণ প্রকৃতির বাহ্যতম ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই তার ব্যবহার, স্থূল উপরি-চর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুরই প্রকৃতজ্ঞান তার এখনও হয়নি। এই প্রাণ বা জীবনীশক্তির স্বরূপ শারীরিক নয়, এ শক্তি জড়ীয় নয় বরং এ একটা পৃথক তত্ত্ব যা জড়কে ধারণ করে এবং জড়ে যা নিবর্তিত আছে। সব আকার সে-ই ধারণ করে' আছে, সব আকারে সে-ই ব্যাপ্ত হয়ে আছে আর সেই শক্তি ব্যতীত কোন স্থূল আকারই উৎপন্ন বা স্থায়ী হতে পারত না। বিদ্যুৎ প্রভৃতি সব জড়শক্তির মধ্যেই সে কাজ করে, আর এসব জড়-শক্তির মধ্যে যা শুদ্ধশক্তির নিকটতম তার মধ্যেই তার প্রকাশ হয় সবচেয়ে বেশী ; সে-শক্তি না থাকলে এসব কোন জড়শক্তিই বর্তমান থাকতে বা কাজ করতে পারত না কারণ এসবের স্রোত ও গতি দুই-ই উদ্ভূত হয়েছে সেই শক্তি থেকে, এরা সব তারই বাহন। তবে, এসব জড়ীয় বিভা-বই প্রাণের প্রয়োগের ক্ষেত্র বা তার রূপভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ প্রাণ হল শুদ্ধ ক্রিয়াশক্তি, এসবের হেতু বা পরিণাম নয়। সুতরাং জড়ীয় কোন বিশ্লেষণেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে না ; জড়ীয় বিশ্লেষণ পারে শুধু প্রাণের প্রয়োগফলে যে-সব স্থূল ব্যাপার ঘটে, প্রাণের স্পর্শ বা ক্রিয়ার যা বাহ্যনির্দর্শন বা প্রতীক, তাদের সব সমবায়ের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করে' দেখাতে।

তাহলে আমরা তার অস্তিত্ব অবগত হই কি উপায়ে? দেহ-মন বিশুদ্ধ করে' সংবেদন ও জ্ঞানের করণগুলিকে সূক্ষ্মতর করে', আর

তা সম্ভব হয় যোগের দ্বারা। তাতে বস্তুপিণ্ডের স্থূল উপাদান নির্ণয় করা ছাড়া অন্যপ্রকারের বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমাদের হয় : আমরা বিশুদ্ধ মনোময় তত্ত্বের ক্রিয়াকে জড়-তত্ত্বের ক্রিয়া থেকে পৃথক রূপে চিনতে পারি, আর তাদের উভয় থেকে পৃথক করে', যে-জৈব বা প্রৈতি-তত্ত্ব, তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে ও তাদের ধারণ করে তার ক্রিয়াকেও বিবিক্ত ভাবে দেখতে পারি। আর, সে কেবল স্থূল দেহেই নয়; যোগের দ্বারা সন্ধান পাওয়া যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থাতে আমরা যে-দেহকে জানি তার অভ্যন্তরে, তাকে পোষণ ও ধারণ করে' আছে আমাদের সত্তার আর এক সূক্ষ্ম বিগ্রহ ; আর সে-দেহে প্রবাহিত প্রাণের ধারাও আমরা বিবিক্ত করে' নির্ধারণ করতে পারি। সাধারণতঃ তা সাধিত হয় প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও সংযমন করে'। দেহের এবং দেহাশ্রিত জীবন ও মনের স্বাভাবিক সব ব্যাপার সম্পাদনের জন্য প্রাণশক্তির যে-সব সাধারণ সুনির্দিষ্ট ক্রিয়ার বেশী কিছু প্রকৃতির প্রয়োজন হয় না সে-সবকেই হঠযোগীরা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে, সংযম করতে, অতিক্রম করতে বা স্তম্ভিত করতে পারেন এবং যেসব পথ ধরে' নিজেকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে সে-শক্তি তার সব কাজ করে তাও তিনি জানতে পারেন। তাই, তাঁর দেহকে দিয়ে তিনি এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে অতিপ্রাকৃত বলে' মনে হবে ; ঠিক যেমন, জড়বিজ্ঞানী জড়শক্তির ক্রিয়ার ধারা জানেন বলে' সে-সবকে দিয়ে এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা আমাদের কাছে যাদুবিদ্যা বলে' মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সে-সবের নিয়ম ও কার্যক্রম বিশদ করে' প্রকাশ না করেন। কারণ, এই স্থূল দেহে জীবনের সব ক্রিয়াই— স্বাভাবিক নিত্য ক্রিয়া বা সর্বদা সম্ভাবনীয় বলে' যাকে সহজেই ফুটিয়ে তুলে কাজে লাগান যেতে পারে সে-সব ত বটেই, গভীরে নিহিত যেসব ক্রিয়াবীজের উদ্‌গম-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে' আমাদের সাধারণ

অভিজ্ঞতাতে কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হয় সেসব ক্রিয়াও—নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণশক্তির দ্বারা।

শুধু দেহাশ্রিত জীবনের নয়, সজীব দেহাশ্রিত মনের সব কাজও এই প্রাণশক্তিই চালায়। সুতরাং প্রাণশক্তি নিয়মনেব দ্বারা আমাদের দৈহিক ও জৈব ক্রিয়াবৃত্তি সব নিয়ন্ত্রিত করে' সেসবের সাধারণ কার্য-ক্ষমতা যেমন অতিক্রম করা যায়, তেমনি আবার মনের ক্রিয়াবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করে' তার সাধারণ কর্মক্ষমতাও অতিক্রম করা যায়। প্রকৃত পক্ষে মানব-মনকে সর্বদাই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ মনের প্রকাশ হয় দেহকে অবলম্বন করে' আর দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটায় প্রাণশক্তি ; সুতরাং প্রাণশক্তির যতটা সে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে বা নিজের অভিপ্রায়ের অনুগামী করতে পেরেছে শুধু সেই পরিমাণেই মন তার শক্তি বিস্তার করতে পারে। সুতরাং যে-পরিমাণে কোন যোগী প্রাণশক্তিকে সংযত করতে সমর্থ হন এবং সে-শক্তি প্রয়োগ করে' যে-সব চক্র বা নাড়ীকেন্দ্রে প্রাণশক্তি এখনও শ্লথগতিতে প্রবাহিত হচেছ্ বা আংশিক ভাবে কাজ করছে তাদের উন্মুক্ত করতে পারেন সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত মন-ইন্দ্রিয়-চেতনার সব ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারেন। এই সবকেই বলা হয় যোগের বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি আর সে-সব স্বতঃই প্রকটিত হয় যখন যোগী প্রাণশক্তি সংযমের সাধনাতে অগ্রসর হন এবং সে শক্তি-প্রবাহের সব প্রণালী শোধন করে' সূক্ষ্ম অন্তশ্চর সত্তার সঙ্গে স্থূল শারীর বহিশ্চর অস্তিত্বের আদানপ্রদানের পথ খুলে দিতে পারেন।

অতএব, প্রাণ হল জৈব বা স্নায়বিক শক্তি, দেহমনের সব ব্যাপার সে বহন করে, তারা তাকে যেন রথে অশ্বের মত যোজনা করেছে, মন নিজের অভিলষিত পথ বেয়ে নিজের বাসনার লক্ষ্যের দিকে তাকে

চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই, তার বর্ণনাতে উপনিষদ বলেছে 'যুক্ত', 'প্রৈতি', 'প্রণীয়তে'—যোজনা করা হয়েছে, এগিয়ে চলেছে, আগে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ঋগ্বেদে প্রাণশক্তিকে সর্বদা অশ্বের রূপকে সংজ্ঞিত করা হয়েছে আর এই সব উপমাতে সেই বৈদিক রূপকই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, জগতের সব কাজ সেই শক্তিই করে, অবশ্য সচেতন বা অবচেতন মনের নির্দেশ পালন করে' এবং জড়শক্তি ও জড় আধারের ধর্ম ও সীমা সব মেনে নিয়ে। মন যেমন আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-গতিবৃত্তি এই শারীর ও প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের ভূমিতে এবং অজ্ঞানের উপাধিত্রয়ের সীমার মধ্যে ব্রহ্মের জ্ঞানের দিককে বা জ্ঞাতৃ-চৈতন্যকে প্রতিমূর্ত করে, এবং দেহ যেমন সেই একই ভাবে প্রাতিভাসিক জগতে বিভাজ্য পদার্থের ছদ্মবেশে পরম সৎস্বরূপের সত্তাকে প্রতিমূর্ত করে, তেমনি প্রাণ বা জীবনীশক্তি প্রাতিভাসিক সববস্তুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে তাঁর নিজের সত্তার সব অভিব্যক্তির শাস্তা-ভোক্তা-মহেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি বা কর্মপ্রবৃত্ত প্রৈতিকে প্রতিরূপিত করে। সেই সার্বভৌম শক্তি প্রতি অণুতে, প্রতি কণাতে বিদ্যমান রয়েছে এবং যে অবিরাম গতিপ্রবাহ ও আদানপ্রদান দিয়ে জগৎ গঠিত তার প্রতি তরঙ্গে, প্রতি উচ্ছ্বাসে সেই শক্তিই কাজ করছে।

তবে, যেমন মন চিন্ময় সত্তার এক নিম্নতর অভিব্যক্তি মাত্র আর তার উর্ধ্বে রয়েছে সে অজ্ঞান মনের নিয়ন্তা সম্বিৎ-ইচ্ছা-জ্ঞানের দিব্য অসীম তত্ত্ব এবং ব্রহ্ম তাঁর নিজের স্বরূপ ও অভিব্যক্তি অবগত হন সেই তত্ত্ব দিয়ে, মন দিয়ে নয়, প্রাণশক্তির বেলাতেও ঠিক তাই। আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তি প্রকাশের বিশিষ্ট লক্ষণ হল বাসনা, ক্ষুধা এবং ভোগ্যবস্তুকে গ্রাস করে' ভোগ করা ; আর তার ক্রিয়া ও গতির ধারা হল অধিকার করবার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে সন্ধান করা এবং কাম্য বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে,'

বেষ্টন করে,' তাতে প্রবেশ করে' তাকে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করা।*
এই বাসনা ও মর্ত্যসম্ভোগের বায়ুতে প্রকৃত জীবন গঠিত হতে পারে না বা দিব্যশক্তি কাজ করতে পারে না, যেমন অজ্ঞান অনিশ্চিত অন্ধ-প্রায় সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত মনের সংজ্ঞা নিয়ে পরমজ্ঞানের চিন্তার কাজ চলে না। মনের ক্রিয়া-বৃত্তি যেমন দ্বৈতবোধ ও অজ্ঞানের ভাষাতে সত্যের অনুবাদ মাত্র, পরমচেতনা ও জ্ঞানের প্রতিফলন মাত্র, তেমনি এই প্রাণশক্তির গতি-বৃত্তিও পরাশক্তির ক্রিয়ার সেই একই প্রকারের প্রতিরূপ বই নয়; আর সে পরাশক্তি যে উর্ধ্বতর সত্যতর অস্তিত্বকে অভিব্যক্ত করছে তা সেই পরম চেতনা ও জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তা অশনা বাসনা বা ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগের বাধাব্যাহত ক্রিয়া থেকে মুক্ত। এখানে যা বাসনা সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেম, এখানে যা ক্ষুধা সেখানে তা অবশ্যই নিস্পৃহ পরিতৃপ্তি, এখানে যা সম্ভোগ সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, এখানে যা দ্বিধাজড়িত অন্ধক্রিয়া সেখানে তা অবশ্যই অমোঘ স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি। আমাদের প্রাণের যে প্রাণ এই নিম্নতর ক্রিয়াকে পোষণ করে' তার লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিত করছে এই-ই তার স্বরূপ। ব্রহ্ম এই বায়ুতে নিঃশ্বাস নেন না, এই জীবনীশক্তি এবং তার জন্মমৃত্যুরূপ দ্বৈতের দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করেন না।

তাহলে, আমাদের এই প্রাণের প্রাণ কি বস্তু? সে-ই পরাশক্তি,† নিজের জ্যোতির্ময় সত্তাতে কর্ম-প্রবৃত্ত পরম চিন্ময় পুরুষেরই অনন্ত শক্তি। স্বয়ম্ভূ আত্মজ্ঞানে উদ্ভাসিত, তাঁর আত্মানন্দ পরিপূর্ণ; সে

* 'প্রাণ' অর্থে 'অশ্ব' শব্দ ব্যবহার করে' বেদের ঋষিরা এই সবগুলি অর্থই বোঝাতে চেয়েছিলেন কারণ 'অশ্ব' শব্দের মূল ধাতুর এই সব অর্থই করা যায়, যেমন :— 'আশ্' (আশা), 'অশনা' (ক্ষুধা), 'অশ্' (আহার), 'অশ্' (ভোগ), 'আশু' (দ্রুত), 'অস্', 'অচ্' (গতি, প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি), ইত্যাদি।

† তপস্ বা চিৎশক্তি

আত্মজ্ঞান স্বরূপতঃ কালাতীত ও স্বরাট, তবে কর্মপ্রবৃত্তিতে তার প্রকাশ হয় সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম অন্তহীন চেতনার শক্তিরূপে। কারণ, তাঁর অস্তিত্বের দুইটি কোটি আছে : একটি হল শুদ্ধ নৈস্তব্ধ্য এবং শুদ্ধ অদ্বয়ত্ব, অপরটি হল শাশ্বত প্রৈতি এবং তাঁর নিজের সঙ্গে সর্বময়ের একাত্মত্ব ; আর সে প্রৈতি নৈস্তব্ধ্যেই নিত্য আশ্রিত। এই হল সত্য অস্তিত্ব—যে পরমপ্রাণ থেকে আমাদের প্রাণ উৎসারিত ; এই-ই অমৃতত্ব আর আমরা জীবন বলে' যাকে আঁকড়ে ধরে' রাখি সে হল "মৃত্যুরূপী অশনা"।* . সুতরাং চেতনাকে আলোকিত করে' এবং জীবন-মৃত্যুর মিথ্যা প্রাতিভাসিক সংজ্ঞা অতিক্রম করে' এই অমৃতত্বে উপনীত হবার লক্ষ্য প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই রাখতে হবে।

কিন্তু এই প্রাণশক্তির ক্রিয়া যতই নিকৃষ্ট হক না কেন তার অতিশয়ী যে বৃহত্তর শক্তির সে প্রতিরূপ তারই সত্তা-ইচ্ছা-আলোকের দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হচ্ছে : সেই তৎ-স্বরূপের দ্বারাই সে তার নানা পথ বেয়ে 'প্রণীত' বা অগ্রে চালিত হচ্ছে যে-লক্ষ্যের দিকে, তার নির্দেশ পাওয়া যায় তার নিজেরই অস্তিত্ব থেকে, তারই গতি ও প্রকাশ ধারার ত্রুটি দেখে। জীবন নামে অভিহিত এই মৃত্যু সেই আলোরই কাল ছবি, উপরন্তু সে-ই হল আমাদের উত্তরণের সরণী, সেই পথ ধরেই সত্তার রূপান্তর সাধন করে' আমরা জড়ের মৃত্যু-নিদ্রা থেকে আত্মার অমৃতত্বে উপনীত হব।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।২।১

১১

প্রথম খণ্ডের ভাবার্থ

এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে স্বল্পাক্ষর অর্থগর্ভ বাক্যে, উপনিষদের রীতিতে, যা বলা হয়েছে তার ভাব তাহলে দাঁড়ায় যে, মন ইন্দ্রিয় বা জৈব ব্যাপার, যে সব নিয়ে আমরা ব্যাপৃত থাকি, তা আমাদের অস্তিত্বের সবটা ত নয়ই, প্রধান অংশও নয় ; তা আমাদের উর্ধ্বতম সত্তা নয় তার অস্তিত্ব স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, সে নিজের স্বতন্ত্র প্রভুও নয়। তার ওপারে আছে কিছু যার সে বসনপ্রান্ত, অবর পরিণাম ও গৌণক্রিয়া ; এই মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণ ও অতৃপ্তিকর, আংশিক ও বিভক্ত চেতনা ও ক্রিয়াকে গড়ে তুলে এক অতিচেতন অস্তিত্ব তাকে পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। উপরতলের এই বহিশ্চর চেতনাকে অতিক্রম করে', সেই অতিচেতনার দিকে অধিরোহণ করে' তাতে প্রবেশ করাই হল আমাদের প্রগতির পথ ও লক্ষ্য, সেই আমাদের নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা।

আমাদের বর্তমান অস্তিত্বকে এ উপনিষদে অবাস্তব বলা হয় নাই, অসম্পূর্ণ ও নিম্নতর বলা হয়েছে। এখানে আমরা যা অনুসরণ করি তা হল অস্তিত্বের উর্ধ্বতর ভূমিতে পরম পরাকাষ্ঠারূপে যা নিত্য বর্তমান তারই অপূর্ণ প্রতিরূপ ও আংশিক বিভক্ত ক্রিয়া। আমাদের মন তার বিষয়ের অধিকার থেকে ভ্রষ্ট, সংশয়ে দোলায়িত, অন্ধপ্রায়, ভ্রম-অক্ষমতার দ্বারা অবরুদ্ধ ; বস্তুর বাহ্যরূপের প্রতীতির উপর তার ক্রিয়া

প্রতিষ্ঠিত; তবু সে যে অতিচেতন জ্ঞানের ছায়া সে-জ্ঞান সব বস্তুর সত্যই দর্শন করে, প্রকাশ করে, যথাযথরূপে প্রয়োগ করে কারণ তার কাছে কিছুই বাহ্য বা অনাত্ম নয়, তার সর্বগ্রাহী আত্মপ্রতীতিতে বিভক্ত বা স্ববিরোধী কিছুই নাই। সে-ই আমাদের মনের মন। আমাদের বাক্য পরিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রবৎ চালিত, বস্তুর বাহ্যরূপই অপূর্ণভাবে সে বিবৃত করে, মনের সংকীর্ণ পরিধিতে তা সঙ্কুচিত, ইন্দ্রিয়ের আপাতবোধের উপর তা প্রতিষ্ঠিত ; তবু আমাদের মন ও বাক্য যে-সব আকার উপলব্ধি বা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে সেসবের নির্মাতা, পরম-অভিব্যঞ্জক সৃষ্টিপর পরাবাকেরই সে দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও অজ্ঞান প্রতিস্পন্দন। আমাদের ইন্দ্রিয় হল আমাদের চেতনার উপাদানের যে গতি-বৃত্তি বাহ্য অভিঘাতের প্রতিস্পন্দন তুলে, বিভিন্নপথে কেন্দ্রাভিসারী প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বহু আয়াসে তাদের মর্মগ্রহণ করতে চেষ্টা করে ; তবু সে যার দোষবহুল প্রতিচ্ছবি সে পরমসংবোধ দিব্য অসীম অস্তিত্বের আত্মতৃপ্ত ক্রিয়াপ্রসঙ্গে পরম মন ও বাক্যের সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ও যুগপৎ ,সম্পূর্ণ ও সুষমভাবে একাত্ম হয়ে সে-সব ভোগ করে। আমাদের প্রাণ হল সাকার দেহমনের সঙ্গে সংযুক্ত, গতি-শক্তি-ভোগধর্মী নিঃশ্বাস বায়ু ; তার আকারের সীমায় সে পীড়িত, তার শক্তি ক্ষুদ্র, তার গতি বাধাখণ্ডিত, তার অধিকার রিপুবেষ্টিত আর তাই সে বিরোধে ভরা— নিজের সঙ্গে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সদা বিগ্রহে রত ; সে ক্ষুৎপীড়িত ও অতৃপ্তকাম, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অস্থিরচিত্তে ধাবমান ও বহুবিষয় একযোগে ধারণ ও গ্রহণ করতে অক্ষম ; সে ভোগ করে ভোগ্যবস্তুকে গ্রাস করে', তাই তার সম্ভোগ হয় ক্ষণস্থায়ী। তবু সে এক অখণ্ড অসীম প্রাণের ক্ষুদ্র ভগ্নগতি বই নয় আর সে-প্রাণ সর্বরাট সর্বপ্রভু ও নিত্য-তৃপ্ত ; কারণ, সববস্তুর মধ্যেই সে তার শাশ্বত দেশকাল-নিমিত্ত-মুক্ত সত্তাকে ভোগ করে—দেশবিভাগ তাকে আবদ্ধ করে না,

কালগতি তাকে অধিকার করে না, কার্যকারণ বা নিমিত্তের পৌর্বাপর্য তাকে বিভ্রান্ত করে না।

এই এক অদ্বিতীয় অতিচেতন অস্তিত্ব নিজের আত্মসংহত শাশ্বত শান্তি ও সর্বজ্ঞ সর্বক্ষম ক্রিয়াশক্তি উভয়ই অবগত আছেন ; আমাদের বিশ্ব-অস্তিত্বও তিনি জানেন, তাকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করে' আছেন, নিগূঢ় থেকে তাকে অনুপ্রেরণা দিচেছন, সর্বশক্তিমানরূপে তাকে শাসন করছেন। তিনিই ঈশোপনিষদের ঈশ্বর, তাঁর শক্তির সমস্ত সৃষ্টিতে, "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ",* চিরচঞ্চল জগতীতত্ত্বের সমস্ত গতিতে, তিনিই বাস করেন। তিনিই ব্রহ্ম, আমাদের আত্মা এবং আমরা—আমাদের সত্তা, ক্রিয়া সব—গঠিত যে উপাদানে এবং যাঁর দ্বারা। মর্ত্যজীবন সেই তৎ-স্বরূপেরই দ্বিদল প্রতিকৃতি, তাঁরই ভাব-ও অভাবাত্মক দুই বিরোধী প্রত্যবয়ব। তাঁর ভাবাত্মক অবয়ব যা এখনও অর্জন করতে পারে নি সে-সবকে কাল ছায়ামূর্তির আবরণে ঢেকে তাদের পুষ্টির সহায়তা করছে মৃত্যু-দুঃখ-অক্ষমতা, বিভাজন-সীমাবন্ধন প্রভৃতি তাঁর অভাবাত্মক অবয়ব : জীবনের কাছ থেকে অমরত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে মৃত্যুরূপে, ভোগসুখের কাছ থেকে আনন্দ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দুঃখ-বেদনারূপে, সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র প্রয়াসের কাছ থেকে অসীমশক্তি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে অক্ষমতারূপে, বাসনার কাছ থেকে প্রেমের একান্ত মিলন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বিরোধ-রূপে, অর্জনের কাছ থেকে একাত্মত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে বিভাজনরূপে, পুষ্টির কাছ থেকে আনন্ত্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সীমাবন্ধন-রূপে। ভাবাত্মক অবয়বগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্রহ্ম কি, যদিও ব্রহ্ম যা তারা তা কখনই নয় ; তথাপি তাদের জয়ে—দেবতাদের জয়ে—ব্রহ্মের জয় হয় তাঁরই অভাবাত্মক প্রতিষেধের বিরুদ্ধে, ভূমার আত্মপ্রতিষ্ঠা

* ঈশোপনিষদ, ১

হয় স্বল্পে অবরুদ্ধ তমসাচছন্ন স্থূলরূপের দ্বারা তার প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে। তবু, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এই ভূমামাত্রই নন, তিনি নির্বিশেষ কেবল আনন্ত্য। আর সেই জন্যই, এই দ্বৈতময় স্থূলরূপের মধ্যে আমরা আমাদের আত্মাতে, আমাদের ঊর্ধ্বতম সত্তাতে, অধিরোহণ করতে পারি না ; তাকে পেতে হলে এসব ছাড়িয়ে যেতে হবে। এই দ্বৈত অস্তিত্বের ভাবাত্মক অবয়ব গুলি অনুসরণ করে', দেহ-প্রাণ-মনের দেবতাদের পূজা করে' আমরা আমাদের আত্মার প্রকৃত সাধনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি মাত্র ; যদি আমরা আমাদের প্রকৃত সার্থকতা চাই তাহলে এই নিম্নতর ব্রহ্মকে বর্জন করে' ঊর্ধ্বতর ব্রহ্মকে জানতে হবে। যেমন, মনকে পরিপুষ্ট করে' আমরা মনোময় জীবে পরিণত হই, ''ধীরাঃ''—ধীশক্তি ও ধী-সম্পদে সমৃদ্ধ হই, যাতে মনের চিন্তার দ্বারা মনকেই অতিক্রম করে' আমরা পরম শাশ্বতে যেতে পারি। কারণ, ইন্দ্রিয় ও মনের জীবন চিরকাল মৃত্যু ও সীমাবন্ধনের অধিকারে থাকবে, অমৃতত্ব আছে তার ওপারে।

সুতরাং বিজ্ঞব্যক্তিরা, ভাস্বর ধীশক্তিতে অধিষ্ঠিত কৃতবিদ্য জীবেরা, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বৈত পরিহার করে' এই বিশ্ব ছেড়ে অগ্রসর হন, ওপারে একত্ব ও অমৃতত্বে গমন করেন তাঁরা। এখানে অগ্রসর হওয়া অর্থে যে-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাতে মৃত্যুপ্রয়াণও বোঝায় ; সেই শব্দই আবার এই উপনিষদে অন্যত্র ('প্রাণঃ প্রৈতি যুক্তঃ' এই বাক্যে) ব্যবহৃত হয়েছে দেহাশ্রিত মনের রথে যোজিত প্রাণশক্তির জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে যাওয়ার অর্থে। এই সমার্থকতা থেকে দুটি অতি সারগর্ভ নির্দেশ পাওয়া যায়।

অস্তিত্বের অপর কোন অনুকূলতর লোকে গিয়ে অমৃতত্ব সন্ধান কর-বার উদ্দেশ্যে এই পার্থিব জীবন পরিহার করে' সেই মহৎ সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হবে না। 'ইহৈব', এখানেই, এই মর্ত্য জীবনে ও দেহে

সেই অমৃতত্ব অর্জন করতে হবে, এই দেহাশ্রিত জীবের দ্বারাই সেই উর্ধ্বতর ব্রহ্মকে জানতে ও পেতে হবে। 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ', এখানে যদি তাঁকে না জানা যায় তবে মহা সর্বনাশ। আমাদের মধ্যে এই প্রাণশক্তি পরম জীবনের আকর্ষণে অগ্রে নীত হয়ে তার অবিরাম অর্জনের পথ বেয়ে ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে ক্রমে এমন এক বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয় যেখানে তাকে একেবারে এগিয়ে যেতে হবে, এই মর্ত্যজীবন--বিশ্ববস্তুর এই মৃত্যুগ্রস্ত প্রতীতি—অতিক্রম করে' সবের অতীত কিছুর দিকে সর্বতোভাবে প্রয়াণ করতে হবে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করা পর্যন্ত এই প্রয়াণকে বর্ণনা করা হয় মৃত্যু নামে এবং মৃত্যুহীন পরলোকে গমন বলে ; এখানে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অমৃতত্বের যে-রূপ উপলব্ধি করা হয়েছে তারই অনুরূপ ভাবের অমৃতত্ব সে-সব লোকে আস্বাদন করা যায়, কিন্তু তাতে মৃত্যুর ও সীমাবন্ধনের আকর্ষণ অতিক্রম করা হয় না ; কারণ, তার আবরণে অমৃতত্ব-অসীমত্বের কিছু না কিছু ঢাকা থাকে যা এখানে আমাদের পাওয়া হয় নি, সুতরাং প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতাও থাকে, মর্ত্যদেহে পুনর্জন্মের সনির্বন্ধ প্রয়োজন থাকে আর তাকে জয় করা যায় না যতক্ষণ না ব্রহ্মের সব প্রতিরূপ অতিক্রম করে' সেই অসীম অদ্বিতীয় অমৃতের পরম স্ব-রূপে অধিরোহণ করা হয়।

এ উপনিষদে যে-সব লোকের কথা বলা হয়েছে তত্ত্বতঃ সেসব হল বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা, বিশ্বের দেশগত বিভাগ নয়। এই জড়বিশ্বও ত অস্তিত্বেরই একটা বিশেষ রূপ, যে-রূপে আমরা অস্তিত্বকে দেখি যখন আমাদের জীব জড়ীয় গতিবৃত্তি ও জড়ীয় অনুভবের ভূমিতে অবস্থান করে, যখন আত্মা আকারে অভিনিবিষ্ট হয়ে যায় আর সেই কারণেই সে তার জীবনের সাহায্যে যে পরিধির মধ্যে চলাফেরা করে এবং তার চেতনা দিয়ে যে উপাধি অবলম্বন করে সে-সবই

নির্ণীত হয় অন্তহীন বিভাজন-সংযোজন তত্ত্বের দ্বারা, অর্থাৎ জড়ের, সাকার পদার্থের স্বধর্মের দ্বারা। সে-ই তখন হয় তার জগৎ, তার বিষয়দর্শন। এবং আত্মার যে অবস্থাতে, যে-লোকেই, জীব অধিরোহণ করে তার বিষয়দর্শনও পরিবর্তিত হয়ে সেই অবস্থা বা লোকের অনুরূপ হয়, এবং সেই পরিধির মধ্যে তার জীবনের গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকে, তার চেতনা সেই উপাধিকেই অবলম্বন করে। এই হল প্রাচীন ঐতিহ্যের সব লোক।

কিন্তু যে-জীব অমৃতত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন এ-সব লোক তিনি অতিক্রম করে' চলে যান, সব উপাধি থেকে তিনি মুক্ত হন। তিনি পরমেশ্বরের সত্তাতে প্রবেশ করেন এবং সেই অতিচেতন আত্মন্ ও ব্রহ্মের মতই জীবন মরণের বশীভূত হন না। তিনি জন্মান্তর চক্রে প্রবেশের প্রয়োজনের অধীন নন, নিয়ত জন্মমৃত্যু ও ভাবাভাবের দ্বৈতবন্ধনের মধ্যে যাতায়াত করতে বাধ্য নন, কারণ নামরূপ তিনি অতিক্রম করেছেন। এই বিজয়, এই পরম অমৃতত্ব তাঁকে এখানেই, মর্ত্য স্থূল পরিবেশে দেহ-ধারী জীবের অবস্থাতেই অর্জন করতে হবে। পরে, ব্রহ্মেরই মত বিশ্ব অস্তিত্ব অতিক্রম করে' এবং তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে', তার অধীন না হয়ে তিনি তাকে স্বীকার করতে পারেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সার্থকতা অধিগত হবে জীবের এই বিকারী ব্যক্তিরূপের বন্ধন থেকে মুক্তির দ্বারা, সেই এক সর্বময়ে আত্ম-উন্নয়নের দ্বারা। পরে যদি কখনও তিনি মর্ত দেহে জন্মগ্রহণ করেন তাতে সে বিগ্রহ ধারণ করা হয় মাত্র, তার অধীনতা স্বীকার করা হয় না ; তাতে বিশ্বকে সাহায্য করা হয়, বিশ্ব থেকে কোন সাহায্য নেওয়া হয় না ; অতিচেতন সত্তার জীবে অবতরণ হয় তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়, বিশ্বপ্রয়াসের সার্বজনীন প্রয়োজনে—যারা এখনও অমুক্ত, অকৃতার্থ তাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করে' সাহায্য করতে, যে-শক্তি নিজের

প্রথম খণ্ডের ভাবার্থ

অভিজ্ঞতার ফলে প্রগতির পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম করে' চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে এবং সেই একই অবস্থার মধ্যে এ পরমব্রত উদ্‌যাপন করেছে এবং এ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছে।

১২

ব্রহ্ম জ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

আমরা কি এবং ব্রহ্মই বা কি, এই স্বরূপগত পার্থক্য বিবেচনা করে', মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের ভাব থেকে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর পরাচেতনার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে রূপান্তর সাধনের কি উপায়—সে-প্রশ্ন বিচার করবার পূর্বে আর একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে। পরিষ্কার করে' উত্থাপন করা না হলেও এ উপনিষদে সে-প্রশ্ন ধরে' নিয়ে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে, তার সমাধানের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে এবং তাতে যে আপাত-বিরোধ রয়েছে সূক্ষ্মতম প্রভেদ দেখিয়ে তার পুনরুক্তি করা হয়েছে।

ব্রহ্মের ঐশী চেতনা পেতে হলে আমাদের এই বিশ্বে প্রকৃতির ক্রিয়ার অধীন স্পষ্টজীবের ক্ষুদ্রতর ভাব সব বর্জন করতে হবে; কিন্তু সে ঐশী চেতনা যতই উচ্চ বা বিরাট হোক না কেন, এই বিশ্বের সঙ্গে, জগতের গতির সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ তার অবশ্যই আছে; সব সম্বন্ধের অতীত অব্যবহার্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম তা হতে পারে না। যে চিন্ময় সত্তা আমাদের মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের শাস্তা-ভর্ত্তা-স্রষ্টা তিনি মহেশ্বর; কিন্তু যেখানে সাপেক্ষ কোন বিশ্ব নাই সেখানে কোন মহেশ্বর থাকাও সম্ভব নয়, কারণ যেখানে কোন গতি বা ক্রিয়াই নাই সেখানে শাসন বা অতিক্রম করবার কথাই ওঠে না। তাহলে কি মহেশ্বর (পরবর্ত্তী যুগের ভাষায়) মায়ার স্রষ্টা না হয়ে বরং মায়ারই সৃষ্ট হন না? সকল

বিশ্বই অতিক্রম করে' গেলে বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরও কি বিলুপ্ত হন না ? পরম সদ্বস্তু কি সব বিশ্বের ওপারে অবস্থিত নন ? তবে, যা আমাদের জানতে হবে, পেতে হবে সে কি আমাদের মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, প্রাণের প্রাণ, বাক্যের পশ্চাতে বাক্ না হয়ে সেই একমাত্র বিশ্বাতীত সদ্বস্তুই হয় না ? আমাদের যেমন সব কার্যের পশ্চাতে পরম কারণে যেতে হবে, তেমনই কি পরম কারণকেও অতিক্রম করে' যাতে কার্যকারণ কিছুই নাই তাতে যেতে হবে না ? বেদে উপনিষদে যে অমৃতত্বের কথা বলা হয়েছে তাও কি একটা ক্ষুদ্র বস্তুমাত্র নয় ? আর তাকেও কি অতিক্রম করতে, বর্জন করতে হবে না ? এবং যেখানে মরত্ব-অমরত্বের অর্থ লোপ পায় সেই চরম অনির্বচনীয়কে পেতে চেষ্টা করতে হবে না ?

অবশ্য, এ-ভাবে বা এ ভাষাতে উপনিষদের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নি ; বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবে আমাদের চিন্তার পুরাতন রূপ লোপ পেয়ে দার্শনিক সংজ্ঞা ও ভাষা পরিবর্তিত হবার পূর্বে তা সম্ভবপর ছিল না। বিশ্বেশ্বর যেমন বিশ্বে যা-কিছু আছে সে-সবের চরম নিরপেক্ষ সত্য, তেমনি সেই বিশ্বেশ্বরের চরম সত্য ও অনপেক্ষ কৈবল্যরূপী অনির্বচনীয় সৎ-ও এ উপনিষদের অজ্ঞাত নয়। আর মানুষের মন একমাত্র যে-ভাবে তাঁর কথা বলতে পারে সেই ভাবেই তাঁর কথাও এখানে বলা হয়েছে।

এই সমস্যার উত্তরে এ উপনিষদে বলা হল যে, তৎস্বরূপ অবশ্যই অতর্ক্য অজ্ঞেয় অব্যবহার্য, তাঁর উপর কোন সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। তাই তাঁর বিষয়ে আমাদের মনীষা নির্বাক থাকতে বাধ্য। সে-অজ্ঞেয়কে জানবার অনুশাসনও অর্থহীন এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনশূন্য। তার কারণ এ নয় যে, তৎস্বরূপ মহাশূন্য বা অভাবাত্মক ; তার কারণ, আমাদের মন বাক্য বা প্রতীতি যে-সব ভাবাত্মক সংজ্ঞা দিতে সক্ষম তার কোনটা

দিয়েই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না, এমন কি তার কোনটা থেকে তার কোন নির্দেশ অবধি পাওয়া যায় না। আমরা জানি অতি অল্প, আর সেই অল্পের সংজ্ঞাতেই আমাদের সব জ্ঞানের রূপ দিতে হয়। এমন কি ওপারে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত পরম স্বরূপে উপনীত হলেও আমরা তার প্রকৃত কোন বর্ণনা দিতে পারি না, ইঙ্গিতে তার নির্দেশ দিতে পারি মাত্র। সুতরাং, যদি আমরা মনে করি যে, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জেনেছি তাহলে তাতে আমাদের জ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়, দেখানো হয় যে, আমরা তাঁকে অতি অল্পই জেনেছি, এমন কি আমাদের অল্প জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে তাঁর যতটার রূপ দেওয়া যায় সেটুকুও জানতে পারি নি। কারণ, এই বিশ্বই অল্প, বিভক্ত; অস্তিত্ব ও চেতনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সেই সব অংশ দিয়েই আমরা সব বস্তুর খণ্ডিত-রূপ জানি ও প্রকাশ করি; আমাদের ভাষা ও বিচার বুদ্ধির গড়া সেই সব কৃত্রিম সংজ্ঞার পিঞ্জরে অনন্তের সমগ্রতাকে আবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নয়। তথাপি সে তৎস্বরূপে ত আমাদের উপনীত হতে হবে বিশ্বে অভিব্যক্ত সব তত্ত্বকেই অবলম্বন করে'—প্রাণ মন অবলম্বন করে' আর, যে-সব ভাব মনে হয় যেন ব্রহ্মকে পরিব্যক্ত করবে কিন্তু আসলে রুদ্ধদ্বারের আড়ালে তাঁকে লুকিয়ে রাখে সে-সব মৌলিক প্রত্যয় উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান অবলম্বন করে'।

সুতরাং, পরব্রহ্মের বিগ্রহ যে ঐশীচেতনা তার বিষয়ে আমাদের জ্ঞানই যদি এই প্রকারের হয়, তাহলে সব জ্ঞানের অতীত পরাৎপর কেবল অনির্বচনীয় সদ্বস্তুকে জানবার সম্ভাবনা আমাদের আরও কত কম। কিন্তু এই-ই সব হলে' ত জীবের কোন আশাই থাকত না আর বিজ্ঞতার শেষ কথা হত নীরবে নিশ্চেষ্ট হয়ে অজ্ঞেয়বাদ মেনে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের জ্ঞানের ও মনোবৃত্তির অতীত হলেও পরম আমাদের জ্ঞানের কাছে এবং আমাদের মনোবৃত্তির কাছে ধরা দেন তাদের প্রত্যেকের

গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট উপায়ে ; আর সেই পথ ধরেই আমরা তাঁর কাছে উপনীত হতে পারি, কিন্তু একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা মন দিয়ে যে মনন করি বা উর্ধ্বতর বুদ্ধি দিয়ে যা জানি তাকে যেন আমরা পূর্ণ জ্ঞান বলে' গ্রহণ না করি বা সেই পাওয়াতেই তৃপ্ত হয়ে নিশ্চেষ্ট না থাকি।

সে পথ হল, আমাদের মনকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে' তার বিশুদ্ধতম, উর্ধ্বতম শক্তির অধিগম্য জ্ঞান অর্জন করা। যে-বিশ্বে আমরা বাস করি তা দিয়ে তার অন্তঃপ্রবিষ্ট অথচ তাব অতিশয়ী মহেশ্বরের ঐশী চেতনাকে জানতে হবে, পরব্রহ্মের সে-ই বিগ্রহ। কিন্তু, প্রথমতঃ, বিশ্বে যা শুধু বাহ্যরূপ ও প্রতিভাস সে-সবকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে ; কারণ, পরব্রহ্মের রূপের সঙ্গে বা পরমাত্মার কায়ার সঙ্গে সে-সবের কোন সম্পর্ক নাই যেহেতু সে-সব ত তাঁর বিগ্রহ নয়, তাঁর বাহ্যতম আবরণ মাত্র। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য হল, জড়-প্রাণ-মনের সব রূপের পশ্চাতে গিয়ে সে সবের যা সারস্বরূপ, যা বাস্তবতম এবং যা প্রকৃত সত্তার নিকটতম তাতে ফিরে যেতে হবে। এবং এইভাবে অবান্তর সব বর্জন করে', সব আকারকে বিশ্বের মৌলিক বস্তুতে বিশ্লেষণ করে' চললে দেখব যে, মৌলিক বস্তু রয়েছে মাত্র দুটি—আমরা ও দেবতারা।

ধরে' নেওয়া হয় যে, উপনিষদের দেবতারা ইন্দ্রিয়ের একটা প্রতীক মাত্র ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করলেও ইন্দ্রিয়গুলির চেয়ে তাঁরা অনেক বৃহত্তর। বিশ্বজগতের সব মৌলিক বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত দিব্য শক্তি তাঁরা, তা সে শক্তির প্রকাশ মানুষের মধ্যেই হক বা সাধারণভাবে মন-প্রাণ-জড়ের মধ্যেই হক ; এই সব ক্রিয়াবৃত্তিও তাঁরা নন, তাঁরা ভগবানেরই কিয়দংশ—যে-অংশ তাঁদের ক্রিয়ার জন্য অবশ্য-প্রয়োজন এবং যা সেই সব ক্রিয়ার অব্যবহিত অধ্যক্ষ ও হেতু। অন্য

উপনিষদ থেকেও দেখতে পাই যে, দেবতারা হলেন ব্রহ্মের যে-সব সদর্থক আত্মরূপায়ণ আমাদের নিয়ে যায় মঙ্গল-আনন্দ-আলোক-প্রেম-অমৃতত্বের দিকে, সে-সবের অন্ধতামস প্রতিষেধের সব বিরুদ্ধতা কাটিয়ে। আর, অবশ্যই সে-সংগ্রাম চরমে ওঠে এবং তার তাৎপর্য প্রায় পূর্ণ প্রকটিত হয় মানবের মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে ও বাক্যে। সে-সবকে দেবতারা চান চান মঙ্গল-আলোকের দিকে চালিয়ে নিতে আর অন্ধকারের পুত্র দানবেরা চায় অজ্ঞান-অমঙ্গলের দ্বারা বিদ্ধ করতে।* বিশ্বব্যাপারে দেবতারা যাঁর সদাত্মক রূপায়ণ সেই বিশ্বস্বামীর চেতনা রয়েছে তাঁদের পশ্চাতে।

বিশ্বে ব্রহ্মের অপর প্রতিরূপটি হল জীবিত চিন্তাশীল সৃষ্টপ্রাণীর অধ্যাত্ম সত্তা—মানবাত্মা। সে সত্তাও বাহ্য ছদ্মরূপ মাত্র নয়, দেহের প্রাণের বা মনের আকার মাত্র নয়। এসবকে সেই ধারণ করে' আছে, এসবের স্থিতি সেই সম্ভবপর করেছে। দেবতাদের মতনই সে বলতে পারে আমি সৎ, মায়া নাই। তাহলে এই দুটি সত্তাকে পরীক্ষা করে' দেখতে হবে এরা কি, এদের মধ্যে সম্পর্ক কি আর ব্রহ্মের সঙ্গেই বা এদের উভয়ের সম্পর্ক কি ; অথবা, এ উপনিষদের ভাষায় 'যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু অথ নু মীমাংস্যমেব তে'—তাঁর যতটা তুমি আর তাঁর যতটা দেবতাদের মধ্যে এই বিষয় তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। বেশ, তাহলে ব্রহ্মের কতটা আমি নিজে ? আর, ব্রহ্মের কি-ই বা আছে দেবতাদের মধ্যে ? উত্তর সুস্পষ্ট : আমি বিশ্বে পরমাত্মার প্রতিরূপ, কিন্তু বিশ্বপ্রসঙ্গে প্রকৃত প্রতিরূপ ; আর দেবতারা বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের প্রতিরূপ—তাঁরাও বাস্তব প্রতিরূপ-ই, কারণ দেবতাদের ছেড়ে বিশ্ব চলে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই সব ব্যষ্টি অস্তিত্বের সারস্বরূপ, সেই এক বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্বে দেবতাদের পরমদৈবত।

* যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১৷৩ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১৷২

পরমাত্মা ও বিশ্বেশ্বর একই ব্রহ্ম ; তাঁকে আমরা আমাদের সত্তার মধ্যেও উপলব্ধি করতে পারি, আবার জগদ্ব্যাপারের মূলগতির মধ্যেও উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সত্তা যেমন আমাদের মন-দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত, পরমাত্মার সত্তাও তেমনি নিখিল মন-দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত; সব বস্তুরই সেই প্রভব ও সারস্বরূপ। আবার আমাদের ব্যষ্টিজীবের ক্ষুদ্র বিশ্ব, আমাদের মন-প্রাণ-দেহের ক্রিয়া, যেমন দেবতারা শাসন করেন আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তেমনি সমগ্র বিশ্ব, সব সাকার জীব শাসন করেন মহেশ্বর—মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়রূপে—তাঁর সক্রিয় দেবত্বকে তাঁর নিস্তব্ধ স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে'। বিশ্বে রূপের এবং বিশ্বের সত্তা ও গতির সারস্বরূপে উপনীত হয়ে যেমন আমরা আমাদের আত্মার ও দেবতা-দের সন্ধান পেয়েছি, তেমনি আমাদের আত্মার ও দেবতাদেরও পশ্চাতে গিয়ে এক পরমাত্মাকে, এক পরমদৈবতকে পেতে হবে। তাহলেই আমরা বলতে পাব, 'মন্যে বিদিতং', মনে হয় জেনেছি।

কিন্তু বলেই আবার সে উক্তির সীমানির্দেশ করতে হয়। আমি যে সম্পূর্ণ জেনেছি তা মনে করি না, কারণ আমাদের জ্ঞানার্জনের করণ-গুলির সংজ্ঞাতে তা অসম্ভব। মুহূর্তের তরেও মনে করি না যে, অজ্ঞেয়কে জানতে পারি ; মনে করি না যে, যে-সব রূপ অবলম্বন করে' আত্মন্ বা মহেশ্বরে উপনীত হতে হয় সে-সবে দিয়ে তৎস্বরূপকে বাঁধা যায়। তবে সেই সঙ্গে বলতে হয় যে, তাঁর বিষয়ে আমি আর অজ্ঞও নই ; কারণ, আমি ব্রহ্মকে জানি একমাত্র যে-ভাবে তাঁকে জানা যায় : জানি আমার মনোবৃত্তির উপলব্ধির সীমার অনতীত সংজ্ঞাতে, জানি আমার কছে তাঁর আবির্ভাবের মধ্যে, জানি আত্মা ও মহেশ্বররূপে তাঁর অভিব্যক্তিতে। এতেই, অস্তিত্বের রহস্য এই যে-ভাবে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করা হয় তাতে-ই, আমার সত্তা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ; কারণ, প্রথমতঃ তাতে এইসব

প্রতীকের মধ্যে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি তা বুঝতে পারি, এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, ব্রহ্মে বাস করতে পারি, ধর্ম ও সত্তাতে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, এমন কি ব্রহ্মের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করতে পারি।

যদি ভাবি যে, মন দিয়ে আমরা ব্রহ্মের মর্ম গ্রহণ করেছি, আর সেই ভ্রমের বশে তাঁর সম্বন্ধে আমাদেব জ্ঞান যদি আমাদের মনের দ্বারা আবিষ্কৃত সংজ্ঞার নিগড়ে বেঁধে রাখি তাহলে আমাদের জ্ঞান জ্ঞানই হল না ; সে হল অল্পজ্ঞান, তা মিথ্যাতেই পরিণত হয়। তেমনি আবার, সাধারণ মানবপ্রতীতির চেয়ে উর্ধ্বতর চিন্তা অবলম্বন করে' যে-সব মৌলিক ভাব দিয়ে তাঁকে নির্ণয় করা যায় সেই সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণার দ্বারা যারা তাঁকে বিশেষ করে' জানতে চায়, তাদেরও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথার্থ বিশেষ জ্ঞান হয় না, কারণ তাতে ভাগবত প্রতীককেই প্রকৃত বস্তু বলে' গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে, যদি এই সব মানসপ্রতীতিকে কেবল-মাত্র অনুসন্ধানের সূত্র বলে' মেনে নিয়ে তাদের ধরে' তাদের উর্ধ্বে উঠতে পারি ; এবং যদি এই সব ভাগবত প্রতীকগুলিকে এবং আমাদের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নির্দিষ্ট সে সবের বিন্যাসকে ব্যবহার করে' সে প্রতীকগুলিকে অতিক্রম করে' পরম সদ্বস্তুতে যেতে পারি, তবেই আমাদের মন ও বিচারবুদ্ধিকে তাদের পরম প্রয়োজনে ঠিকমত ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্ম যে তাদের অতিক্রম করে' আছেন সেই বোধের দ্বারাই তাহলে আমাদের মন ও উর্ধ্বতর ধীশক্তি ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

আমাদের মনোবৃত্তির কাছে পরম যে-ভাবে নিজেকে বিবৃত করেন, এক রকমের পরম অনুভূতি ও পরম উদ্বোধনের অবস্থাতে আমাদের মন তাঁর একটা চিত্র বা একটা রূপ প্রতিবিম্বিত করতে পারে মাত্র। এই প্রতিবিম্ব থেকেই আমরা তাঁর সন্ধান পাই, তাঁকে জানি ; জ্ঞানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কারণ আমরা অমরত্ব লাভ করি, ব্রহ্মচেতনার ধর্ম-সত্তা-

আনন্দে প্রবেশ করি। আমাদের আত্মারূপে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে' পাই বল, পাই দিব্যবীর্য যা সীমা-বন্ধন দুর্বলতা অন্ধকার দুঃখ ও মরজীবনের সর্বব্যাপী মৃত্যুর ওপারে আমাদের উত্তীর্ণ করে; সব সত্তাতে, জগতের সব বহুমুখী গতিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জেনে, সে-সব অতিক্রম করে' আমরা উপনীত হই সেই দিব্য অস্তিত্বের আনন্ত্যে, সর্বশক্তিমান সত্তাতে, সর্বজ্ঞ আলোকে, কেবল পরমানন্দে।

এই মহৎ সিদ্ধি এখানে, এই মর্ত্যজগতে, এই সসীম দেহেই অর্জন করতে হবে; কারণ তা হ'লেই আমরা আমাদের সত্য অস্তিত্বে উপনীত হই, আমাদের প্রাতিভাসিক জীবনে আর আবদ্ধ থাকি না; কিন্তু এখানে তা না হলে 'মহতী বিনষ্টি', আত্যন্তিক ক্ষতি ও নিরয়, কারণ আমরা দেহমনের প্রাতিভাসিক জীবনেই অবিরাম নিমজ্জিত থাকি, তার উপরের সত্য অতিমানস অস্তিত্বে অধিরোহণ করতে পারি না। আর, এখানে যদি তা হারাই তা হলে মৃত্যুও আমাদের এমন কোন লোকে নিয়ে যাবে না যেখানে তাঁকে পাওয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য হবে। যাঁরা তাঁদের প্রবুদ্ধ প্রদীপ্ত চিন্তার সহায়ে সব অস্তিত্বের মধ্যে পৃথক করে' সেই এক অদ্বিতীয় অমর সত্তাকে, সবের প্রভব আত্মাকে, সর্বত্র অন্তরস্থ মহেশ্বরকে আবিষ্কার করেন, জন্মমৃত্যুর অতিগামী প্রকৃত উত্তরণ সম্ভব হয় তাঁদেরই, তাঁরাই এই মর্ত্য অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সবেগে সব অতিক্রম করে' ঊর্ধ্বে বিশ্বাতীত অমরত্বে উপনীত হতে পারেন।

তাহলে এই অনন্য উপায় আঁকড়ে ধরতে হবে, এই অনন্যলক্ষ্যে উপস্থিত হতে হবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়", এই মহৎ যাত্রার আর কোন পথ নাই। সেই অনির্দেশ্য অজ্ঞেয় অনির্বচনীয় পরব্রহ্মই পরমাত্মা ও মহেশ্বর; এমনকি আমাদের কাছে যা অজ্ঞেয় অনির্দেশ্য তাঁর অনুসন্ধানে রত হলেও আমরা সেই পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে পাই,

তবে সে-প্রয়াস দেহধারী যে-জীব তার প্রকৃত অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে চায় তার জন্য অভিপ্রেত ঋজু ও সহজসাধ্য পথ নয়।* আত্ম-অভিব্যক্ত পরম সদ্বস্তু এইভাবে পরমেশ্বর ও পরমাত্মারূপে মানুষের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন তার উর্ধ্বতম অভীপ্সার বিষয়রূপে, তার সব ক্রিয়ার সমাপত্তিরূপে।

* গীতা, ১২, ৪-৫

১৩

দেবতা ও ব্রহ্ম

তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ খণ্ড, শ্লোক ১-৩

এ উপনিষদে বলা হল যে, অজ্ঞেয় ব্রহ্মের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভব সুতরাং জীবের বর্তমান সামর্থ্য ও সংস্থিতির যা ওপারে তার বিষয়ে অভীপ্সা অযৌক্তিক নয়; এখন আলোচনা করা হচ্ছে কি উপায়ে সে ঊর্ধ্ব-প্রসারী অভীপ্সা তার উপাস্যের সংস্পর্শে আসতে পারে, কি করে' অবগুণ্ঠন ভেদ করে' পরবশ মানবচেতনা মহেশ্বরের ঐশীচেতনাতে প্রবেশ করতে পারে, কোন্ সেতুর দ্বারা এই গভীর ব্যবধান অতিক্রম করতে পারে। পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের গ্রহণযোগ্য প্রধান উপায় হল জ্ঞান—প্রবুদ্ধ মনের বোধের দ্বারা সত্য অস্তিত্বের কোন না কোন প্রকার মনন বা পর্যালোচনা থেকে যে-জ্ঞানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু মন ত একজন দেবতা, তার পশ্চাতের আলোকই ত ইন্দ্র, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর চাই সব দেবতাদের বোধন—দেবতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর সহায়ে তাঁদের যা সার-স্বরূপ, যে এক পরম-দেবের তাঁরা প্রতিভূ, তাঁর প্রতি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের মনোবৃত্তি একবার আমাদের মনের পশ্চাতে মনের দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করলে, আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাক্যও নিজেদের খুলে ধরবে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরম ইন্দ্রিয়ের দিকে, বাক্যের পশ্চাতে পরাবাকের দিকে; এবং প্রাণও নিজেকে খুলবে আমাদের প্রাণের প্রাণের দিকে। এবার এই উপনিষদের তার এই মূল নির্দেশের পরিণতি বিবৃত করা হয়েছে একটা হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যান বা রূপক-কথা দিয়ে।

কেনোপনিষদ

মঙ্গল-আলোক, সুখ-সৌন্দর্য, বীর্য-স্বামিত্ব এসব প্রতিষ্ঠা করে যে-সব শক্তি তারাই দেবতা ; সে-সব অস্বীকার করে যে-সব আসুরিক শক্তি তাদের বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামে দেবতারা একবার জয়যুক্ত হল। ব্রহ্মই দেবতাদের পশ্চাতে থেকে তাদের হয়ে বিজয় অর্জন করেছেন, সর্বনিয়ন্তা বিশ্বস্বামী তাঁর সর্ববিধায়িনী ইচ্ছাশক্তিকে সম্ভাবনার দোলাতে নিক্ষেপ করে' এ বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন—তাঁর তমসাচ্ছন্ন সন্তানদের দমন করে' তাঁর জ্যোতির সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বিশ্বস্বামীর এই বিজয়ে দেবতারা বোধ করেছেন যে, তাঁদের বিরাট প্রসার হয়েছে, মানুষের মধ্যে তাঁদের মহিমা, তাঁদের হর্ষসুখ, তাঁদের জ্যোতি, তাঁদের প্রভাব, তাঁদের কীর্তি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি এখনও তাঁদের গভীরতর সত্যের বিষয়ে অন্ধ ; তাঁরা নিজে-দেরই জানেন ব্রহ্মকে জানেন না, দেবতাদের জানেন পরমদেবকে জানেন না। সুতরাং এ বিজয়, এ মহিমা তাঁরা নিজেদের বলেই দেখেছেন। দেবতাদের এই সমৃদ্ধ বিকাশের, তাদের জ্যোতিঃ ও মহিমার উপচয়ের অর্থ হল তার সাধারণ আদর্শের দিকে মানবের অগ্রগতি ; সে আদর্শ হল—সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত মনোবৃত্তি, সবল অপ্রমত্ত জীবনীশক্তি, সুনিয়ত দেহ ও ইন্দ্রিয়, এবং সুষম সমৃদ্ধ কর্মিষ্ঠ সুখী জীবন ; প্রাচীন গ্রীসের এই আদর্শ বর্তমান জগতে আমাদের অগ্রগতির চরম সম্ভাবনা বলে গৃহীত হয়েছে। কোন ব্যক্তিতে বা জাতিতে এইরূপ বিকাশ হলে মানুষের মধ্যে দেবতারা উদ্ভাসিত, বলবান ও সুখী হন, তাঁরা অনুভব করেন যে, তাঁরা জগৎ জয় করেছেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে' তাঁরা জগৎকে ভোগ করতে যান।

কিন্তু, বিশ্বে বা জীবে ব্রহ্মের অভিপ্রায়ের এই-ই সবটা নয়। দেবতা-দের মহিমাতে তাঁর নিজেরই বিজয় ও মহিমা, কিন্তু তা দেওয়া হয় শুধু যাতে মানুষ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে প্রায় এমন অবস্থায় আসতে পারে যাতে

তার সব বৃত্তি নিজেদের অতিক্রম করে' বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করবার বল পায়। সুতরাং উল্লসিত দেবতাদের সম্মুখে, তাঁদের সুবিন্যস্ত জগতে ব্রহ্ম আবির্ভূত হন; তাঁদের হৃদয় কম্পিত করে', বিশ্ব কম্পিত করে', তাঁর নৈস্তব্ধ্যের দ্বারাতেই প্রশ্ন তোলেন তাঁদের কাছে, "তোমরাই যদি সব, তাহলে আমি কে? কারণ, দেখ, আমি আছি আর এখানেই আছি।" তিনি আবির্ভূত হন বটে কিন্তু নিজেকে বিবৃত করেন না, দেবতারা তাঁকে জানেন না কিন্তু দেখতে পান, অস্পষ্ট ও ভয়ানক রূপে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেন—যেন কোন যক্ষ, পূজার্হ মহাভূত বা অধ্যাত্ম পুরুষ, যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি, যেন শুভাশুভের অতীত কোন পরম ভয়ঙ্কর যাঁর কাছে শুভাশুভ দুই-ই চরম আত্ম-অভিব্যক্তির অনুকূল যন্ত্রমাত্র। তখন দেবসঙ্ঘে একটা আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা আসে, তাঁরা একটা দাবী, একটা স্পর্ধার আহ্বান, একটা আসন্ন বিপদ অনুভব করেন: অমঙ্গলের দিক থেকে আশঙ্কা করেন এখনও অজ্ঞাত ও অপরাজিত সব ভয়াবহ বিকট আসুরিক শক্তির উৎপাতের সম্ভাবনা,—দেবতাদের গড়া এই সুন্দর জগৎ তারা হয়ত ধ্বংস করে' দেবে, মনীষা সুরুচি সুনীতি জৈব-বাসনা দেহ ইন্দ্রিয়, এ সব দিয়ে যে-সুষমা তাঁরা এত পরিশ্রম করে' গড়ে তুলেছেন তা হয়ত তারা বিপর্যস্ত করে', চূর্ণবিচূর্ণ করে' দেবে; আবার মঙ্গলের দিক থেকে অনুভব করেন অজ্ঞাতের একটা দাবী, যা এসবের অতীত সুতরাং সমানই ভয়াবহ—কারণ, উপলব্ধ হয়েছে অতি অল্পমাত্র, প্রচুর অনুপলব্ধের সামনে তা দাঁড়াতে পারে না, যে ক্ষণভঙ্গুর প্রাচীর তুলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ও সুখের অবধি নির্ণয় করে' তাদের রক্ষা করি তার উপর ভূমা ও আনন্ত্যের অবিরাম চাপ আর সে নিরোধ করতে পারে না। দেবতাদের সম্মুখে ব্রহ্ম আবির্ভূত হন অজ্ঞাতরূপে, দেবতারা জানেন না এ যক্ষ, এ মহাভূতটি কি।

সুতরাং, তাঁর প্রকৃতি-সীমা-পরিচয় জানতে দেবতাদের আদেশে প্রথম উঠলেন অগ্নি। উপনিষদের ও ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে; কারণ ঋগ্বেদে দেবতারা পরম অদ্বিতীয়ের শক্তি মাত্র নন, তাঁদের উদ্ভব ও তাঁদের প্রকৃত স্বরূপের একত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন; তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, সেই পরমদৈবতের মধ্যে বাস করেন, সেই অতিচেতন সত্যই তাঁদের স্ব-ধাম ও স্ব-লোক। অবশ্য, মানুষের মধ্যে তাঁরা অভিব্যক্ত হন মানববৃত্তিরূপে, মানব অস্তিত্বের সব সীমা বাহ্যতঃ মেনে নিয়ে, আর এই নিম্নতর বিশ্বে তাঁরা অভিব্যক্ত হন বিশ্বব্যাপারের ছাঁচ বা সংগঠনের ধারা মেনে নিয়ে। কিন্তু এ হল তাঁদের ক্ষুদ্রতর নিম্নতর প্রকাশ, এসবের ওপারে তাঁরা নিত্যস্বরূপে সেই এক সর্বাতীত এবং অদ্ভুত শক্তি-আনন্দ-জ্ঞান-সত্তার অধীশ্বর। কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মের ধারণা প্রসারিত হয়ে দেবতাদের এই প্রাধান্যের শিখর থেকে বিচ্যুত করে' দিয়েছে, তাই কেবলমাত্র মানবের ও বিশ্বের মধ্যে তাঁদের নিম্নতর ক্রিয়াতে তাঁদের আমরা দেখতে পাই। তবে, বেদোক্ত ভাবের অনেকটাই এ উপনিষদে বর্তমান আছে। এখানে ইন্দ্র-বায়ু-অগ্নি এই দেবতাত্রয় হলেন বিশ্বের ভূমিত্রয়ের এক একটিতে সার্বজনীন বিশ্বেশ্বরের প্রতিভূ: ইন্দ্র মনের, বায়ু প্রাণের, অগ্নি স্থূল জড়ের ভূমিতে। সুতরাং এই অনুক্রমে, জড়ভূমি থেকে আরম্ভ করে তাঁরা ব্রহ্মের সম্মুখীন হন।

জড়ে অনুস্যূত চিৎশক্তির যে উত্তাপ ও শিখা বিশ্বকে গড়ে তুলেছে সেই হল অগ্নি; জড়বিশ্বে অগ্নিই মন-প্রাণের আবির্ভাব সম্ভবপর করেছে, তাদের বৃদ্ধি সাধন করেছে, সেখানে অগ্নিই হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিশেষ করে', যে-বাক্যকে তিনি প্রথম অগ্রে প্রেরণ করেন, বায়ু তার মাধ্যম, ইন্দ্র তার অধীশ্বর। জড়ে অনুস্যূত চিৎশক্তির এই উত্তাপই অগ্নি, তিনি 'জাতবেদা', সর্বজন্মজ্ঞ: বিশ্বে জাত

সব পদার্থের, বিশ্বের সব ব্যাপারের ধর্ম ও কর্মপদ্ধতি, সবের অবধি ও অন্যোন্যসম্বন্ধ, সবই তিনি জানেন। সুতরাং তাঁদের সম্মুখে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি যদি বিশ্বে জাত কোন মহাভূত হন, যদি বিশ্বের সংঘাত বা ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে পূর্বে অনিরূপিত নূতন কিছু গড়ে উঠে থাকে, তবে জাতবেদা অগ্নি ব্যতীত কে তাকে জানবে, কে তার সীমা বল বা অব্যক্ত বিভব নির্দিষ্ট করবে?

পূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হলেন, পেলেন স্পর্ধার আহ্বান. 'কে তুমি? কি বল আছে তোমাতে?' তাঁর নাম জাতবেদা, জড়বিশ্বে সব জন্ম ও কর্মপদ্ধতির মূলে যে-শক্তি রয়েছে তার সব ক্রিয়াবৃত্তি তিনি জানেন এবং ধারণ করে আছেন, আর তাঁর মধ্যে বল রয়েছে যে, এভাবে যা-কিছু জন্মেছে সে সবই তিনি মৃত্যু ও কালের শিখারূপে গ্রাস করতে পারেন। সব বস্তুই তাঁর ভক্ষ্য, সব জীর্ণ করে' তিনি নব জন্মের, নবরূপায়ণের উপাদানে পরিবর্তিত করেন। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী তাঁর সমস্ত বল প্রয়োগ করে' একটা ক্ষীণ দূর্বাদল গ্রাস করতে পারেন না যতক্ষণ ব্রহ্মের শক্তি রয়েছে তার পশ্চাতে। অগ্নি সে যক্ষকে না জেনেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তবে একটা সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, এ মহাভত, এ যক্ষ জড় বিশ্বের কোন জীব নয়, কালের অনল বা ফুৎকারের অধীন কোন নশ্বর বস্তু নয়; তিনি অগ্নির শক্তির অতীত।

দেবতাদের ডাকে আর একজন উঠলেন। তিনি বায়ু 'মাতরিশ্বা'— বৃহৎ প্রাণতত্ত্ব, আকাশ-মায়ের ক্রোড়ে তিনি বিচরণ করেন, নিঃশ্বাস নেন, অনন্তে বিসারিত হন। বিশ্বের সব বস্তুই হল এই প্রবল প্রাণ-শক্তির স্পন্দন, তিনিই অগ্নিকে এনে সববস্তুর অন্তরে স্থাপন করেছেন, তাঁর জন্যই সব জগৎ পর পর নির্মিত হয়েছে, যাতে প্রাণ সে-সবের মধ্যে বিচরণ করতে পারে, কাজ করতে পারে, যথেচ্ছ বিলাস করে' সুখ ভোগ

করতে পারে। এ-যক্ষ যদি জড়ে জাত কোন বস্তু না হয়ে সত্তার গহন গভীরে বা তুঙ্গ শিখরে ক্রিয়মাণ কোন বিরাট প্রাণশক্তি হন, তবে এই বায়ু মাতরিশ্বা ব্যতীত কে তাঁকে জানবে ? কে তাঁকে নিজের সার্বজনীন ব্যাপ্তিতে গ্রহণ করবে ?

আবার হল ভরসা নিয়ে বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া, আবার এল স্পর্ধার সেই ভয়াবহ আহ্বান, "কে তুমি ? কি বল আছে তোমাতে ?' ইনি বায়ু মাতরিশ্বা, তাঁর বল হল তিনি তাঁর পদসঞ্চার ও বৃদ্ধিক্রমে সব-বস্তুই অতি সহজে গ্রহণ করতে পারেন। সব ধরে' শাসন ও ভোগ করতে পারেন। কিন্তু ক্ষীণতম ক্ষুদ্রতম দ্রব্যও তিনি ধারণ করতে বা অভিভূত করতে পারেন না যতক্ষণ তাকে সর্বশক্তিমানের শক্তি তনুত্র হয়ে তাঁর কাছ থেকে রক্ষা করে। বায়ু আবিষ্কার না করে' ফিরে আসেন। তবে, একটা সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে, বিশ্বপ্রাণের কোন শক্তি বা রূপ এ নয়, সর্বগ্রাহী জৈবপ্রেরণার সীমার মধ্যে তাঁর কোন কাজ হয় না ; তিনি বায়ুর অতীত।

তারপর ওঠেন ইন্দ্র মঘবান, শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবান। ইন্দ্র মনের শক্তি ; প্রাণ ভোগের জন্য যেসব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সে সবের ক্রিয়া-বৃত্তি জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্নি এই বিশ্বে যা-কিছু নির্মাণ পালন বা ধ্বংস করেন সে-সবই ইন্দ্রের বিষয়, তার বৃত্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র। সুতরাং এই অজ্ঞাত সত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য কিছু হলে ইন্দ্র তাঁকে জেনে নিজের বিপুল ঐশ্বর্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। কিন্তু সে যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য কিছু নন, কারণ ইন্দ্র অগ্রসর হতেই তিনি অন্তর্ধান করলেন। মন অবধারণ করতে পারে শুধু যা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ আর এই ব্রহ্ম —ঋগ্বেদের ভাষায়—অদ্যও নন কল্য নন।* এবং যদিও সব সচেতন

* ঋগ্বেদ, ১।১৭০।১

অস্তিত্বের চিৎ-সত্তাতে তাঁর স্পন্দন বর্তমান আছে এবং সেখানে তাঁর সান্নিধ্যে আসা যায়, তবুও মন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের মধ্যে তাঁকে সমীক্ষণ করতে গেলেই তিনি মনের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হন। সর্বব্যাপীকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, সর্বজ্ঞকে মনোবৃত্তির দ্বারা জানা যায় না।

কিন্তু অগ্নি-বায়ুর মত, ইন্দ্র অন্বেষণ থেকে বিরত হন না; বিশুদ্ধ মনোবৃত্তির ঊর্ধ্বতম আকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন এবং সেখানে পরাস্ত্রী, বহুশোভমানা বহুদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হৈমবতী উমার সাক্ষাৎ পান; তাঁর কাছ থেকে শেখেন যে, এই যক্ষই ব্রহ্ম, তাঁর বলেই মন-প্রাণ-দেহের দেবতারা জয়লাভ করে' আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন, মহীয়ান হন তাঁরই আশ্রয়ে। উমা হলেন পরাপ্রকৃতি, সমস্ত বিশ্বব্যাপারের জন্ম হয় তাঁর থেকে, এবং তিনি পরম অদ্বিতীয়ের বিশুদ্ধ শিখর-চেতনা ও ঊর্ধ্বতম শক্তি আর এখানে বহুরূপে ভাস্বর। এই পরা-প্রকৃতিই পরাচেতনা; নিজেদের সত্যরূপ তাঁর কাছ থেকেই দেবতাদের শিখতে হবে। নিজেদের নিম্নতর ক্রিয়াতে আবদ্ধ না থেকে এই পরাপ্রকৃতিকে নিজেদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করেই দেবতাদের অগ্রসর হতে হবে। কারণ, একের জ্ঞান ও চেতনা পরাপ্রকৃতিরই আছে, কিন্তু মন-প্রাণ-দেহাশ্রিত নিম্নতর প্রকৃতি কেবল মাত্র বহুকেই অবধারণ করতে পারে। সুতরাং, যদিও ব্রহ্মের অস্তিত্বের বিষয় প্রথম জেনে, ইন্দ্র বায়ু অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন,—অন্য দেবতারা ব্রহ্মের সান্নিধ্যজনিত স্পর্শ পেয়েছেন মাত্র,—তথাপি আমাদের মধ্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানতে ও পেতে পারেন শুধু যদি পরাচেতনার সংস্পর্শে এসে তাঁরা পরাপ্রকৃতিকে প্রতিফলিত করেন এবং জৈব মানস দৈহিক সব অহঙ্কার অপসারিত করেন, যাতে পরম অদ্বিতীয়কে প্রতিবিম্বিত করা তাদের একমাত্র চেষ্টা হয়। আমাদের দেহাশ্রিত জীবনকে পোষণ

করে যে সচেতন শক্তি তাকে হতে হবে, তার ঊর্ধ্বতম সাধারণ ক্রিয়া যার গোধূলির অর্ধআলোকিত বাহ্য রূপ বই নয়, সেই পরাচেতনা ও শক্তির সরল বিশুদ্ধ বিম্বোদ্‌গ্রাহী ; আমাদের জীবনকে হতে হবে, আমাদের ব্যক্ত ও সুপ্ত জীবনীশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণতম বৈভবের চেয়ে বৃহত্তর, পরম জীবনের—নিস্পন্দভাবে গৃহীত অথচ—বীর্যবান প্রতি-বিম্ব এবং অবিকৃত প্রতিরূপ ; আমাদের মনকেও সন্তুষ্ট থাকতে হবে সেই অতিচেতন অস্তিত্বের প্রতিরূপেব বিশ্বস্ত দর্পণ হয়েই। এইরূপে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় তাদের ক্রিয়ার একমাত্র নিয়ন্তা, আমাদের মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের কাছে সজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করলে, এইরূপে জাগতিক অস্তিত্বের মুখ ফিরিয়ে শাশ্বত অস্তিত্বকে নিষ্ক্রিয় হয়ে প্রতিবিম্বিত করলে এবং ব্রহ্মের প্রকৃতিকে বিশ্বস্তভাবে প্রতিরূপিত করলে, তবে আমরা আশা করতে পারি যে, এখন যা আমাদের চেতনার অতীত তাকে জানতে পারব এবং সেই জ্ঞান অবলম্বন করে' তাতে অধিরোহণ করতে পারব, শাশ্বত অনন্ত মুক্ত ও পূর্ণানন্দময় ক্রিয়ার অধ্যক্ষ, সেই পরম নৈঃশব্দ্যে প্রবেশ করতে পারব।

১৪

ব্রহ্মোপনিষদ

চতুর্থ খণ্ড, শ্লোক ৩-৯

দেখেছি যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় হল, প্রথম, বিশ্বের বাহ্যরূপের পশ্চাতে গিয়ে সুবিন্যস্ত জগতের জন্য যা অপরিহার্য তাকে জানা, আর সে অপরিহার্য বস্তু দ্বিদল : প্রকৃতিতে দেবতারা আর ব্যক্তিতে জীবাত্মা, পরে, তাদেরও পশ্চাতে, তারা যাঁর প্রতিভূ সেই বিশ্বাতীতে উপনীত হওয়া। দিব্যজ্ঞানের এই ধারাতে ব্রহ্মের সঙ্গে দেবতাদের ব্যবহারিক সম্বন্ধ পূর্বেই নির্ণীত হয়েছে। যে-সব জাগতিক ক্রিয়াবৃত্তি অবলম্বন করে' দেবতাদের কাজ হয়— মন প্রাণ বাক্য ইন্দ্রিয় দেহ—তাদের প্রত্যেকেরই বোধ জাগতে হবে যে, তাদের ওপারে কেহ আছেন যিনি তাদের নিয়ন্তা, যাঁর উপর তাদের অস্তিত্ব ও তাদের গতিবৃত্তি নির্ভর করে, যাঁর শক্তিতে তাদের ক্রমপরিণতি হয়, নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি হয়, শক্তি আনন্দ ও সামর্থ্য লাভ হয় ; নিজস্ব সাধারণ ক্রিয়াবৃত্তি থেকে তাঁর দিকেই তাদের ফিরতে হবে ; সে-সব ছেড়ে, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অহমিকা থেকে উদ্ভূত স্বতন্ত্র-ক্রিয়ার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করে' সজ্ঞানে তাদের অতিশয়ী সেই সত্তার শক্তি-আলোক-আনন্দ গ্রহণের প্রতীক্ষায় নিস্পন্দ হয়ে থাকতে হবে। তার ফলে, নামের অতীত এই দিব্য সত্তা দেবতাদের মধ্যে নিজেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত করেন। তাঁর আলোক অধিকার করে' নেয় মনের চিন্তনবৃত্তিকে, তাঁর শক্তি ও সুখ নেয় প্রাণকে, তাঁর আলোক ও হর্ষোল্লাস নেয় হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়কে। ব্রহ্মের পরম

প্রতিচ্ছবির কিছু অংশ বিশ্বপ্রকৃতিতে পতিত হয়ে তাকে দিব্যপ্রকৃতিতে পরিবর্তিত করে' নেয়।

অলৌকিক উপায়ে চকিতে তা সাধিত হয় না। সে-সব আসে ক্ষণিক স্ফুরণরূপে, ঈশ্বরাদেশরূপে, আকস্মিকস্পর্শ ও দৃষ্টিনিমেষরূপে; যেন সেই স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎ-চমকের মত প্রত্যাদেশের দীপ্ত শিখা আশ্চর্য-রূপে রহস্যোদ্ঘাটন করে' আবার তার গোপন উৎসে ফিরে গেল, যেন অন্তর্দৃষ্টির নয়নপল্লব নিমেষের তরে খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হল, কারণ অবিমিশ্র পরম জ্যোতির দিকে চক্ষু বেশীক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে নি। এই সব সাক্ষাৎ স্পর্শ ও দর্শন ওপার থেকে বার বার এসে দেবতাদের দৃষ্টি এবং তাদের আশাপ্রতীক্ষা উর্ধ্বের উপর নিবদ্ধ করে' দেয় আর অবিরাম অভ্যাসে দেবতাদের গ্রহণনিষ্ঠা এবং নিস্পন্দতা ও স্থায়ী হয়; মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় বিশ্বের বাহ্য রূপের পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে যে সর্বাতি-শয়ী মহিমাকে একমাত্র বিষয়রূপে গ্রহণ করবার সংকল্প করেছে তাঁরই স্মরণ উপলব্ধি ও আনন্দে ক্রমশঃ বেশী করে' একনিষ্ঠ হয়; বাহ্যস্পর্শে সাড়া না দিয়ে তাঁর ডাকই তারা শুনতে শেখে। যে নৈঃশব্দ্য এ সময়ে তাদের উপর অবতরণ করে' তাদের মূল ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয় পরে সে-ই হবে তাদের ব্রহ্ম-স্বরূপ, শাশ্বত নৈঃশব্দ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান। অন্য সাড়া, অন্য ভাব বা অন্য কাজ তারা জানবেই না। মন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই জানবে না বা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই চিন্তা করবে না, প্রাণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর মধ্যে সঞ্চরণ করবে না বা আর কিছু গ্রহণ বা ভোগ করবে না, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই চক্ষু দেখবে না বা কর্ণ শুনবে না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় অনুভব করবে না।

কিন্তু বাহ্যব্যাপারের সম্পূর্ণ বিস্মরণই কি তাহলে চরম লক্ষ্য? মনকে, ইন্দ্রিয়কে কি অন্তরাবৃত হয়ে অন্তহীন সমাধিতে নিমগ্ন থাকতে হবে? প্রাণকেও কি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করতে হবে? তা সম্ভবপর বটে,

যদি আত্মার সেই ইচ্ছাই হয়; কিন্তু তা অনিবার্য বা অপরিহার্য নয়। মনের সত্তা জাগতিক, নিখিল বিশ্বে তা এক অবিভক্ত; প্রাণের, ইন্দ্রিয়ের, এমনকি দেহের জড় উপাদান-ও তাই; সুতরাং, যখন তারা কেবলমাত্র ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্মের জন্য বর্তমান থাকবে তখন সে জাগতিক একত্বের জ্ঞান ত তাদের হবেই, তাছাড়া সে-একত্বও তারা অনুভব করবে, প্রত্যক্ষ বোধ করবে এবং তাতেই তারা বাস করবে। সুতরাং, এখন ব্যক্তিগত মন ইন্দ্রিয় বা প্রাণের কাছে যা বাহ্যবস্তু বলে প্রতীয়মান হয় তার যে-কোনটার দিকে ফিরলেই সেখানে তারা সে-সবের বাহ্য রূপ জানবে না, চিন্তা করবে না, বোধ করবে না, গ্রহণ করবে না বা ভোগ করবে না, করবে সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্মকে-ই। উপরন্তু, বাহ্য অস্তিত্ব তাদের কাছে থাকবেই না, কারণ আমাদের কাছে কোন বস্তুই আর বাহ্য বলে মনে হবে না, সবই —এমনকি সমগ্র বিশ্ব এবং তাতে বিধৃত সবই—মনে হবে অন্তরস্থ। কারণ, অহং-বোধের সীমা, ব্যষ্টিত্বের প্রাচীর ভেঙে যাবে; ব্যষ্টিমন আর নিজের ব্যষ্টিসত্তা জানবে না, জানবে সর্বত্র এক বিশ্বময় মনকে, সব ব্যষ্টিই যে অখণ্ড মনোবৃত্তির বিভিন্ন গ্রন্থি মাত্র; তেমনি ব্যষ্টিপ্রাণ তার পৃথকত্বের বোধ হারিয়ে সব ব্যষ্টিসত্তা যে-প্রাণের ক্রিয়ার অবিভাজ্য প্রবাহের আবর্তমাত্র সেই এক প্রাণরূপে, তারই মধ্যে বর্তমান থাকবে; এমনকি এই দেহের ও ইন্দ্রিয়গুলিরও পৃথক্ অস্তিত্বের জ্ঞান থাকবে না, বস্তুতঃ যে দেহে মানুষের স্থূল আত্মবোধ থাকবে তা হবে সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব,—যেখানেই অবস্থিত থাকুক না কেন—অবিভাজ্য সমগ্র বস্তু-রূপ; এবং ইন্দ্রিয়গুলিও সংবেদনের পরমতত্ত্বে রূপান্তরিত হবে আর তাতে, আমরা যাকে বাহ্য বলি তারও প্রতি দৃশ্যে চক্ষু সর্বদা ব্রহ্মকেই দেখবে, প্রতি শব্দে কর্ণ সর্বদা ব্রহ্মকেই শুনবে, প্রতি স্পর্শে আন্তর ও বাহ্য দেহ ব্রহ্মকেই অনুভব করবে আর প্রত্যেকটি স্পর্শকেও সেই বৃহত্তর দেহেরই আভ্যন্তরীণ স্পর্শ বলে অনুভব করবে। যে-জীবের দেবতারা

এরূপে এই পরম তত্ত্ব ও নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছেন এই বিশ্বে সব নানাত্বের মধ্যেই সে অদ্বিতীয় অনন্য একের সত্য উপলব্ধি করবে। উপরন্তু নিরাকার অনন্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে বিশ্বকেও অতিক্রম করবে,— নিখিল বিশ্বকে নিজের সমপরিমাণ বলেও দেখবে না, দেখবে যেন নিজের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে এই উচচতর উপলব্ধিতে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় প্রথমতঃ জানবে পরম মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়কে নয় বরং সে-সবের উপাদান বস্তুকে। এই পদ্ধতিতে, এইরূপ অবিরাম দর্শন, দিব্য স্পর্শ ও প্রভাবের দ্বারা মনের মন বা অতিচেতন জ্ঞান মানস অবগতির স্থান নিয়ে মনের সব দশন ও চিন্তনকে অতিমানস জ্যোতির ভাস্বর বস্তুতে ও স্পন্দনে পরিবর্তিত করবে। তেমনি আবার, ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরমসম্বোধের বারবার সাক্ষাৎ পেয়ে ইন্দ্রিয়ও বদলে যাবে, বিশ্বের ইন্দ্রিয়-প্রতীতিও পরিবর্তিত হবে—জৈব, মানস ও অতিমানস লোকও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে আর স্থূল প্রত্যক্ষ হবে তার সবশেষের বাহ্যতম ক্ষুদ্রতম ফল। তেমনি, প্রাণও হবে অসীম চিৎ-শক্তির সজ্ঞান সঞ্চরণ, হবে নির্ব্যক্তিক,—কোন বিশেষ কর্ম বা ভোগের সীমার দ্বারা অবরুদ্ধ হবে না বা সে-সবের ফলে আবদ্ধ থাকবে না, কোন দ্বন্দ্ববোধ বা পাপ বা বেদনার দ্বারা পীড়িত হবে না,— হবে বৃহৎ সীমাহীন মৃত্যুহীন। জড়বিশ্বও এ-সব দেবতাদের চোখে হবে অনন্ত জ্যোতির্ময় ও আনন্দময় অতিচেতনের একটা প্রতিরূপ।

এই ত হল দেবতাদের নবরূপায়ণ। আর আত্মার? দেখেছি ত, মূল সত্তা দুটি—দেবতারা ও মানবাত্মা; আর সমস্ত জাগতিক শক্তির চেয়ে আমাদের আত্মা বৃহত্তর, আমাদের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার পক্ষে এই সব ক্ষুদ্রতর দেবতাদের নবরূপায়ণের চেয়ে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আত্মার অনন্যব্রত হওয়া অনেক বেশী প্রয়োজন। সুতরাং, কেবলমাত্র দেবতাদের রূপান্তর হলেই হবে না। এক পরমদৈবতকে লাভ করে তার

স্বভাবে দেবতাদের রূপান্তরিত হতে ত হবেই, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সক্রিয় জাগতিক তত্ত্বগুলিকে সব তত্ত্বের পরমতত্ত্ব সেই এক অদ্বিতীয়ের ক্রিয়াতে পরিণত করতে হবে যাতে নানা বৈশিষ্ট্যবিকাশের লীলা সত্ত্বেও তারা সেই তৎস্বরূপের অবিভক্ত ক্রিয়া ও অখণ্ড অস্তিত্বই হয়ে যাবে ; তদুপরি—আর সেই প্রয়োজনই প্রধানতর—আমাদের মধ্যে দেবতাদের ক্রিয়ার আশ্রয়, আমাদের আত্মাকেও সব ব্যষ্টি অস্তিত্বের এক পরমাত্মাকে, যাঁর দৃষ্টিতে সব ব্যষ্টি আত্মা তাঁর নিজের চেতনারই কেহ বা তমসাচ্ছন্ন, কেহ বা ভাস্বর, বিভিন্ন কেন্দ্র বই নয়, সেই অবিভাজ্য অধ্যাত্মসত্তাকে লাভ করে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।

মানবাত্মা, আবার, মনোময় সত্তার আন্তরপুরুষ, সুতরাং একাজ তার করতে হবে মনের মাধ্যমে। দেবতাদের মধ্যে নবরূপায়ণ সাধন করেন অতিচেতন নিজেই—তাদের মূলবস্তুকে দেখা দিয়ে, আলোকের ঝলকে তাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত করে', যতদিন তারা রূপান্তরিত না হয় ; কিন্তু আর এক উপায়ে কাজ করবার ক্ষমতা মনের আছে, তবে আপাত-দৃষ্টিতে মনের কাজ হলেও বস্তুতঃ তা আত্মারই নিজের প্রকৃত সত্তার অভিমুখে গমন। বোধ হয় যেন, মন ব্রহ্মের দিকে যায়, ব্রহ্মে উপনীত হয় ; মনকে যেন তার নিজের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে তার অতিশয়ী কিছুতে উন্নীত করা হয় ; পরে যদিও মন আবার সাধারণ ভাবের মধ্যে ফিরে আসে, তবু মননের অন্তরস্থ জ্ঞানের সংকল্প মনের দ্বারাতেই বারবার স্মরণ করে মন কোথায় প্রবেশ করেছিল ; পরিশেষে সে-স্মৃতি অবিচ্ছেদে স্থায়ী হয়। তা হবার পর, জীবাত্মা মনের মাধ্যমে ব্রহ্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে, বার বার ব্রহ্মে বাস করে এবং, এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে গৃহীত হয়ে, পরিশেষে সেই সর্বাতীতের মধ্যে নিরাপদে বাস করতে পারে। সে তার মনকে অতিক্রম করে, তার নিজের সত্তার যে-মনোময় ব্যষ্টি রূপায়ণকে বা যে-বিগ্রহকে সে অহং বলে

জানে তাকে অতিক্রম করে, ঊর্ধ্বে আরোহণ করে' সর্বভূতের পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মার যা শ্রেষ্ঠ অভিব্যঞ্জনা সেই আত্মারাম আনন্ত্যের স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-ই হল সর্বাতিশয়ী অমরত্ব, অধ্যাত্ম জীবন; উপনিষদে একেই মানবের চরম লক্ষ্য বলে শিক্ষা দিয়েছে। এর দ্বারাই আমরা মর্ত্য অবস্থা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আত্মার স্বর্গে উপনীত হতে পারি।

তাহলে, তখন দেবতাদের কি হয়? জগতের এবং মহেশ্বর তাঁর সত্তাতে যা-কিছু বিকশিত করেছেন সে-সবের কি হয়? সে-সবই কি অন্তর্হিত হয় না? দেবতাদের এই নবরূপায়ণও কি একটা গৌণ সিদ্ধিমাত্র নয়? আমাদের চূড়ান্ত অধিগম্য, পরমনিঃশ্রেয়সের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে এও কি একটা বিশ্রামের স্থান মাত্র নয়? সেখানে উপনীত হওয়া মাত্র কি তা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় না? এবং দেবতাদের ও বিশ্বের অন্তর্ধানের সঙ্গে কি তার অধ্যক্ষ ঐশীচেতনারও বিলোপ হয় না? আর তার ফলে কি একমাত্র শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা ও নিবৃত্তিতে নিত্য আত্মানন্দে মগ্ন অনির্দেশ্য শুদ্ধ-সৎ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? এই সিদ্ধান্তে এসেছিল পরবর্তী বেদান্তের চরম অদ্বৈত-বাদী শাখা, আর সে-শাখাতে উপনিষদেরও সেই অর্থ করতেই চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, যে ঈশ বা কেনোপনিষদের ভাষাতে এমন কিছুই নাই যা থেকে তার লেশমাত্র আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তা পেতে চাইলে জোর করে তাতে সে অর্থ আরোপ করতে হবে, কারণ বস্তুতঃ যে-ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বরং বেদান্তের অপর সব শাখার সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় যে-সবের মতে চরম লক্ষ্য হল যে, মুক্ত আত্মা নিত্য আনন্দে ব্রহ্মলোকে বাস করবে, অনন্ত সতের সঙ্গে একাত্ম হয়েও, কোন বিশেষভাবে একত্বের মধ্যেও পৃথক্‌ত্বের লীলা উপভোগ করতে সমর্থ হবে।

পরের শ্লোকে পাই এই উপনিষদের শেষ কথা, যে মহৎ সর্বাতিশয়ী উত্তরণের উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল তার ফল, এবং তার পরে পাই, মর্ত্য-অবস্থা অতিক্রম করে' জ্ঞানদীপ্ত জীবাত্মা যে-অমরত্বে উপনীত হন তার বর্ণনা। উপনিষদে বলা হল যে, ব্রহ্মন্, স্বভাবতঃ 'তদ্বন', সেই আনন্দ। 'বন' একটি বৈদিক শব্দ, তার অর্থ, আনন্দ বা আনন্দময়; সুতরাং 'তদ্বন' অর্থ সর্বাতিশয়ী আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (তৃতীয় বল্লী ষষ্ঠ অনুবাকে) তার বিষয় বলা হয়েছে যে, সে-ই পরম ব্রহ্ম, যা কিছু আছে সবই তাথেকে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারাই সব জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর জন্মমৃত্যুর ওপারে প্রয়াণ করে' তাতেই উপনীত হয়। ব্রহ্মকে এই সর্বাতিশয়ী আনন্দরূপে উপাসনা করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে। সুতরাং, উপনিষদের অমরত্বের অর্থও এই পরমানন্দ বই নয়। আর, ব্রহ্মকে পরমানন্দরূপে পাবার ফল কি হবে? যিনি ব্রহ্মকে এইভাবে জেনেছেন তাঁর অভিমুখে সর্বজীবের অভিলাষ প্রবাহিত হয়, তাঁর সঙ্গলাভের ইচ্ছায় সবাই তাঁর কাছে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, দিব্য আনন্দের কেন্দ্র হন তিনি, নিখিল জগতে প্রীতি বিতরণ করেন, হর্ষ-সুখ-প্রেম-আত্মসার্থকতার উৎসরূপে বিশ্বের সর্বজীবকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন।

এই হল এ উপনিষদের চূড়ান্ত আদেশ; উপনিষদ বা পরম সত্যের মর্মকথা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই তথ্য শিক্ষা দেওয়া হল। ব্রহ্মোপনিষদ, বা পরম সতের নিগূঢ় চরম সত্য এই উচ্চারিত হল; তার প্রথম কথা হল, মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্দ্রিয় সবের যে সাপেক্ষাতীত কেবল রূপ রয়েছে তার মধ্যে সেই মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মহেশ্বরের উপাসনা করতে হবে; আর তার শেষ কথা হল, তাঁকে সর্বাতিশয়ী আনন্দরূপে পেতে হবে; তার ফল হবে যে, যে-জীব তাঁকে এইরূপে জেনেছে ও পেয়েছে সে সেই দিব্যানন্দের জীবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হবে,

নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণীই, দিব্য রসোল্লাসের প্রস্রবণের প্রতি যেমন হয়, তাঁর প্রতি ও তেমনই আকৃষ্ট হবে।

আর দুটি শ্লোক দিয়ে এ উপনিষদের বক্তব্য শেষ করা হল, পুরাতন রীতিতে, যেন সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা করে', তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হল। বলা হল যে, এই উপনিষদ বা সব বস্তুর অন্তরতম সত্যের প্রতিষ্ঠা হল তপঃ বা আত্মসংযম অভ্যাস করা, কর্ম এবং দম বা ইন্দ্রিয়-জীবনকে আত্মশক্তির বশীভূত করা। অর্থাৎ, অজ্ঞানে আবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ পরবশতা ছেড়ে প্রভুভাব অর্জনের উপায়রূপে জীবন ও কর্মকে ব্যবহার করতে হবে, যাতে পূর্ণজ্ঞানে সমাসীন পরমাত্মার স্বপ্রতিষ্ঠ স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্যের, নিজের ও অপর সবের উপর ঈশিত্বের, নিকটতর হওয়া যায়। বেদ বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের প্রত্যাদেশ এবং সে-সবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে বলা হল তার সর্বাঙ্গ; অর্থাৎ, তার কেন্দ্রাভিমুখী সব ধারা ও সব ভাব, এই মহৎ সাধনার সব উপাদান, নিজের চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের এই গভীর শিক্ষা, এই সুগভীর আধ্যাত্মিক অভীপ্সা,—সবই পরম জ্ঞানের সুরধুনী, পরম সাধনার সব সূত্রের আকর, সেই মহৎশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সত্য তার আয়তন; তবে সে-সত্য কেবলমাত্র মানসিক বা বুদ্ধিসম্পাদ্য যাথাতথ্য নয়, বৈদিক সাহিত্যে সে অর্থে এ-শব্দ কখনই ব্যবহৃত হত না। সত্য হল প্রকৃত সত্তা, প্রকৃত চেতনা, প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত কর্ম, অস্তিত্বের প্রকৃত আনন্দ এবং এসবের যে চরম মানবীয় ভাব মানুষের পক্ষে সম্ভব, বস্তুতঃ অহঙ্কার ও অজ্ঞানজনিত মিথ্যার যা বিপরীত সে সবই। আর এই উপায়েই—অর্থাৎ নিজের উপর প্রভুত্ব ও আধ্যাত্মিক বীর্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞান ও কর্মকে ব্যবহার করে', জ্ঞানের প্রতি অংশে গভীরভাবে প্রবেশ করে', বেদের মহর্ষিদের মহৎ উদাহরণ অনুসরণ করে' এবং পরম সত্যে বাস করে'—এই উপায়েই এ উপনিষদ আমাদের কাছে ঊর্ধ্বের যে-পথ উন্মুক্ত করেছে সে-পথে চলতে লোকে সমর্থ হয়।

এই অধিরোহণের লক্ষ্য হল সত্য ও বৃহৎ অস্তিত্বের লোক, বেদে তাকে মানবের পরমপদ ও পরমধাম বলা হয়েছে। এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হল 'জ্যেয়' বা বৃহত্তর অনন্ত স্বর্গলোক—বেদের স্বর্গ বা স্বর্লোক ; পুরাণের ক্ষুদ্রতর স্বর্গ অথবা মুণ্ডকোপনিষদের ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মলোক* বা সূর্যরশ্মির জগৎ—যেখানে জীব যায় পুণ্য ধর্মকর্মের দ্বারা, সুকৃত বা শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির দ্বারা, আর সে-পুণ্য ক্ষয় হলে আবার যেখান থেকে পতিত হয়,—সে-লোক এ নয় ; এ হল জন্ম-মৃত্যুর প্রতীকদ্বয়ের অতীত, কঠোপনিষদের† উচ্চতর স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক অথবা মুণ্ডকোপনিষদের উচ্চতর ব্রহ্মলোক‡ যেখানে জীব জ্ঞান ও ত্যাগের দ্বারা প্রবেশ করে। সুতরাং তা অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোন অবস্থা নয়, তা জ্ঞানজগতের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ, সে হল সর্বানন্দময় অস্তিত্বের মধ্যে জীবের অনন্ত অস্তিত্ব, পরমসুখ ; সে সংস্থিতি আবার উচ্চতর গ্রামের : মনের ওপারে পরম-মনের আলোক, প্রাণের ওপারের পরম প্রাণের সুখ ও নিত্য ঈশিত্ব, ইন্দ্রিয়ের ওপারের পরম সম্বোধের ঐশ্বর্য। আর তাতে জীব পূর্ণ আত্মবিস্তার লাভ ত করেই, পরম অদ্বিতীয়ের আনন্ত্যকেও জানে ও পায় ; সে-অমরত্বে তার স্থির প্রতিষ্ঠা হয় কারণ সেখানে পরম নৈঃশব্দ্য ও চিরশান্তিই হল নিত্য জ্ঞান ও অনন্যসাপেক্ষ পরম সুখের নিরাপদ ভিত্তি।

---

* মুণ্ডক ১।২।৫,৬,১০ ;

† কঠোপনিষদ ২।৩।১৮

‡ মুণ্ডক, ৩।২।৬

১৫

এ উপনিষদের মর্মার্থ—বিশ্বে মুক্তজীব

এ উপনিষদের আলোচনা আমাদের এই শেষ হল; পর পর তার প্রত্যেকটি উক্তির নিহিতার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে' মানুষের বাক্যে যা কখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না তার নির্দেশের মূল সূত্ররূপে যে-সব শক্তিমান বাক্য তাতে পেয়েছি সে-সবের তাৎপর্য, বুদ্ধির কাছে যতদূর সম্ভব, সুস্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। তৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম, মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, আমাদের ও দেবতাদের প্রতিপক্ষতা, অজ্ঞেয় হয়েও যা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নয়, মর্ত্যভাব অতিক্রম করা, অমৃতত্ব জয় করা—এ-সব বাক্য এ উপনিষদে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু ধারণা করা গেল।

মূলতঃ এ উপনিষদের শিক্ষা এই আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অস্তিত্বের তিনটি ভাব আছে: মানব মর্ত্যভাব, ব্রহ্মচেতনা বা আমাদের সব সম্বন্ধেরই পরম অনন্যসাপেক্ষ ভাব এবং অজ্ঞেয় সর্বাতীত কৈবল্য ভাব। এক হিসাবে প্রথম ভাবটি ভ্রান্তজ্ঞান ও মিথ্যার অবস্থা, কারণ যেখানে নিগূঢ় সত্য হল সব বস্তুর নিত্য ও একত্ব সেখানে আপাত প্রতীত হয় স্বল্পকালের অবধির মধ্যে সব বিরুদ্ধ অভিঘাতের অনুভব ও তাদের মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়াসের অবিরাম পুনরাবৃত্তি; এখানে দেখি একটা উজ্জ্বল সদর্থক প্রতিরূপ, সেখানে দেখি অন্ধতামস নঞর্থক প্রতিরূপ কিন্তু উভয়ই প্রতিরূপ মাত্র, সত্য কোনটাই নয়; তবুও তার মধ্যেই আমরা অবিরাম বাস করি, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে তার ওপারে। দ্বিতীয় ভাবটি হল এই দ্বৈতক্রিয়ার অধ্যক্ষ, কিন্তু এ-সবের অতীত; সে মহেশ্বর ব্রহ্মেরই সত্যরূপ, কোনক্রমেই মিথ্যা

বা ভ্রমাত্মক নয়, তবে ব্রহ্মের যে সত্যরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের নিত্য অতিমানস সত্তাতে, তাতেই বিধৃত রয়েছে এখানে আংশিক প্রতিরূপে আমরা যা অনুভব করি সে-সবেরই অনন্যসপেক্ষ পরম রূপ। অজ্ঞেয় আমাদের উপলব্ধি-সীমার বাইরে, কারণ স্বরূপতঃ সেই এক বস্তু হলেও আমাদের নিত্য সত্তার উচচতম সংজ্ঞার চেয়েও তা বৃহত্তর, সৎ ও অসৎ দুএরই অতীত; সুতরাং ক্ষণকালের জন্য যা প্রতীয়মান হয় তা ছেড়ে চিরকাল যা আছে তাতে যদি উপনীত হতে চাই, তবে আমাদের অন্বেষণের লক্ষ্য বলে নিতে হবে সেই ব্রহ্মকে আমরা যা তার সঙ্গে যাঁর একটা সম্বন্ধ আছে, সেই মহেশ্বরকে।

ব্রহ্মে উপনীত হওয়াই হল আমাদের মর্ত্যভাব থেকে অমরত্বে মুক্তি; এখানে অমরত্বের অর্থ মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকা নয়, তার অর্থ জন্মমৃত্যুর দ্বৈত প্রতীকের ওপারে আমাদের নিত্য সত্তা ও আনন্দের সত্য আত্মাকে লাভ করা। অমরত্বের অর্থ, আত্মার অনন্যসাপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি, যা জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্মের দ্বারা সেই জীবাত্মারই বিধৃত ক্ষণস্থায়ী বিকারী দেহাশ্রিত জীবনের বিপরীত এবং শুদ্ধমাত্র মনোময় যে-সত্তা এই জগতের জন্মমৃত্যুর নিয়মে হতাশভাবে আবদ্ধ হয়ে এই জগতে বাস করে অথবা অন্ততঃ অজ্ঞানের নিমিত্ত যাকে নিম্নতর প্রকৃতির এই নিয়মের ও অন্যান্য বহু নিয়মের অধীন বলে' প্রতীতি হয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জীবের পক্ষে এ সব অতিক্রম করে' যাবার উপায় হল স্বতন্ত্র ও অনপেক্ষ, নিজের এবং তার বিধৃত সব বিগ্রহের প্রভু, তার প্রকৃত স্বরূপকে জানা ও লাভ করা; আর তাকে জানা ও লাভ করা অর্থই হল ব্রহ্মকে জানা ও লাভ করা। মরলোক থেকে অমরলোকে, দাসত্ববন্ধনের জগৎ থেকে মুক্ত বিশালতার জগতে, সসীম থেকে অসীম দেশে আরোহণ করা তাতেই হয়। পার্থিব সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে' সর্বাতীত পরমানন্দে উন্নীত হওয়াও তাতেই হয়।

আর তা সাধন করতে হবে এই মরজগতের সব বিষয়ের উপর আসক্তি পরিত্যাগ করে'। একত্ব ও অমরত্ব উপলব্ধি করতে হলে মৃত্যু ও দ্বৈতবোধ অপসারিত করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, এ জগতের কোন বিষয়কেই—এমনকি তার ন্যায় আলোক বা সৌন্দর্যকেও—আমাদের অন্বেষণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা ছেড়ে দিতে হবে; এসব অতিক্রম করে' আমাদের যেতে হবে পরম-মঙ্গলের অভিমুখে, সর্বাতীত সত্য আলোক সৌন্দর্যের দিকে—যেখানে এসবের বিপরীত সব প্রতিভাস, যাকে আমরা অশুভ বলি, সে-সবই অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তথাপি, এ জগতে যখন বাস করি, এ জগতেরই কোন না কোন পদার্থকে অবলম্বন করে'ই ত তাকে আমরা অতিক্রম করতে পারব, তারই সব বাহ্যরূপের মধ্য দিয়েই ত সব সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে পাব। সুতরাং, তাদের পরীক্ষা করি; দেখি যে, প্রথম রয়েছে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় এই সব সংগঠন—সবই প্রতিরূপ, ত্রুটিবহুল আভাসমাত্র; পরে দেখি, তাদের পশ্চাতে রয়েছে সব জাগতিক তত্ত্ব যার মধ্য দিয়ে পরমের কাজ হয়। এই জাগতিক তত্ত্বগুলিতে উপনীত হয়ে, বিশ্বে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ও ক্রিয়ার ধারা থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে তারা তাদেরই অদ্বিতীয় পরমদৈবত, মহেশ্বর ব্রহ্মের মধ্যে তাদের নিজেদের পরম উদ্দেশ্য ও অনপেক্ষ ক্রিয়ার ধারা আবিষ্কার করতে পারে; তাদের সেদিকে আকৃষ্ট করে' সাধারণ মনের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' অতিচেতন দিব্যমনের ক্রিয়া আবিকারে, সাধারণ বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' অতিমানস সম্বোধ ও মৌলিক পরা-বাকের আবিকারে, এবং পার্থিব জীবনের বহিশ্চর ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' সর্বাতিশয়ী প্রাণের আবিষ্কারে প্রবর্তিত করতে হবে।

দেবতা ছাড়াও আছে আমাদের আত্মা, আমাদের অন্তরের অধ্যাত্ম-সত্তা যা দেবতাদের এই সব ক্রিয়ার আশ্রয়। আমাদের অধ্যাত্মসত্তাকেও

ফিরতে হবে—ব্যষ্টি দেহ-প্রাণ-মনের গতি প্রবাহে বিজড়িত ও তার অধীন নিজের যে-ছবি সে দেখে, তাতে একান্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ করে' ঊর্ধ্বপানে, এসবের অতীত ও এসবের অধ্যক্ষ, নিজেরই পরম সত্তার দিকে তার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সুতরাং মনকে দিব্য-মনের, ইন্দ্রিয়কে দিব্যসম্বোধের, প্রাণকে দিব্যপ্রাণের ক্রিয়ার প্রতীক্ষায় নিস্পন্দ থাকতে ত হবেই, যাতে ঊর্ধ্বতমের শক্তির অবিরাম সংস্পর্শ ও সন্নিকর্ষের ফলে তারা সে-সব লোকাতীত বৃত্তি প্রতিফলিত করতে পারে ; তদুপরি ব্যষ্টিসত্তাকেও মনের ঊর্ধ্বাশী অভীপ্সার বলে, পার্থিব চেতনার ওপারে নিজেকে উন্নীত করতে হবে আর, সে-শুভক্ষণে যে পরম সত্যের মধ্যে সে অবস্থান করেছে, তাঁকে অবিরাম স্মরণে রেখে পরিশেষে সেই আনন্দ শক্তি ও আলোকে অধিরোহণ করতে হবে।

কিন্তু তার ফলে, জীবকে যে এক, নিজের নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ অস্তিত্বের সমাহিত, সর্ববিস্মৃত পরমসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত হতেই হবে তা নয়। কারণ, মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ তাদের ব্যষ্টি রূপায়ণ অতিক্রম করলে দেখে যে, তারা সব এক অখণ্ড মন-প্রাণ-বস্তুরূপের এক একটা বিশিষ্ট কেন্দ্রমাত্র ; সুতরাং, শুধু ব্যষ্টির সর্বাতিশয়িত্বে নয়, তাতেও তারা ব্রহ্মকেই পায়, এবং শুধু তাদের ব্যষ্টিভাবে ক্রিয়ার মধ্যেই নয়, তার মধ্যেও তারা অতিচেতনের দর্শন নামিয়ে আনে। ব্যষ্টিজীবের মন তার সীমার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরিণত হয় সেই এক বিশ্বজনীন মনে, তার জীবন সেই এক বিশ্বজনীন প্রাণে, তার দেহের বোধ সমগ্র বিশ্বের বোধে, এমন কি, তার চেয়েও বেশী, তারই নিজের অবিভাজ্য ব্রহ্মদেহে। সে তার নিজের মধ্যেই বিশ্বকে দেখে, তার নিজের সত্তাকে অপর সব সত্তার মধ্যে দেখে ; জানে যে, সে-ই অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, বহুধা-বর্তমান একক সর্বান্তর্যামী মহেশ্বর ও সৎ-স্বরূপ। এ উপলব্ধি না হলে অমরত্বের সাধনা তার সম্পূর্ণ

হল না। তাই বলা হল যে, জ্ঞানীরা সব অস্তিত্বের মধ্যেই ব্রহ্মকে নির্ণয় করতে ও দর্শন করতে চান; সেইভাবে সর্বত্র সর্বভূতে ব্রহ্মকে আবিষ্কার করে', উপলব্ধি করে', লাভ করে' তাঁরা অমর অস্তিত্বে উপনীত হন।

তাহলেও, যদিও দেবতাদের বিজয়কে—অর্থাৎ, মঙ্গল-ন্যায়-সুখ-জ্ঞান-শক্তি এই সব সদাত্মক গুণের পূর্ণ পরিণতির দিকে দেহ-প্রাণ-মনের ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াকে—ব্রহ্মের বিজয় বলে গণনা করা হল এবং এই জগতে জীবনকে ও মানবের কর্মকে আত্মপ্রস্তুতি ও আত্মজয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার প্রয়োজন স্বীকার করা হল, তথাপি পরিশেষে অনন্ত ব্রহ্মলোকে বা ব্রহ্মচেতনাব স্থিতিতে প্রয়াণকেই পরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হল। মনে হতেই পারে যে, তাতে জাগতিক জীবনের প্রত্যাখ্যানই সূচিত হল। সুতরাং, আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে—আমরা বর্তমান যুগের মানুষ যারা ক্রমশঃ বেশী সচেতন হচ্ছি যে, আমাদের স্রষ্টা (প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলি) আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, জাতির পক্ষে ব্যক্তিগত মুক্তির চেয়ে বৃহত্তর কর্তব্য আছে, সৃষ্টিতে ভগবানেরও তার চেয়ে মহত্তর অভিপ্রায় আছে কারণ ব্যক্তির চেয়ে বিশ্ব বেশী বাস্তব; আমরা যারা ক্রমশঃ বেশী অনুভব করছি যে, (কোরাণের ভাষায়) মহেশ্বর পরিহাসচ্ছলে স্বর্গমর্ত্য সৃষ্টি করেন নি বা ব্রহ্ম বিকার বা বিভ্রমের ঘোরে বিশ্বস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন নি,—আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ব্যক্তিগত মুক্তির বার্তাই কি এই বিশুদ্ধতর প্রাচীনতর উদারতর বেদান্তেরও একমাত্র বাণী? তা যদি হয় তাহলে, বেদান্ত যত উত্তমই হক না কেন, তা সাধু সন্ন্যাসী তপস্বী বা নির্জন যতীর উপযোগী হতে পারে, কিন্তু আত্মপ্রসারকামী জাগতিক চেতনা তার প্রতীক্ষিত মহামন্ত্র বলে' হৃষ্টচিত্তে যা গ্রহণ করতে পারে এমন কোন বার্তা সে দেয় না। কারণ, স্পষ্টতই, অত্যাবশ্যক

কিছু তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এবং অস্তিত্বের প্রহেলিকার কোন গভীর রহস্য থেকে সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তার সমাধান করতে পারেনি বা সে-কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেনি।

সব উপনিষদেই অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তির উপর, ব্যক্তির নিম্নতর জাগতিক জীবন পরিহার করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর কালে সে জোরের পরিমাণ অত্যধিকই হয়ে উঠেছে। আর, রচনার কাল যত পিছিয়ে এসেছে এ-সুরও ততই তীব্রতর হয়েছে, এবং শেষ-পর্যন্ত স্ফীত হয়ে সর্বপ্রকারের জাগতিক জীবন প্রত্যাখ্যান করাতে এসে দাঁড়িয়েছে; পরিশেষে, পরেকার হিন্দুধর্মে সে-ই হয়েছে প্রায় একমাত্র প্রধান সূত্র আর দৃপ্ত স্পর্ধায় অপর সব মতবাদকেই সে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছে। প্রাচীনতর বৈদিক শ্রুতিতে এ সুর নাই; সেখানে ব্যক্তিগত মুক্তিকে মহৎ জাগতিক বিজয়ের এবং তার ফলে ক্রমে অতিচেতন সত্য ও আনন্দের দ্বারা স্বর্গমর্ত্য বিজয়ের অনুকূল উপায়রূপে দেখা হত, এবং অতীতে সে-বিজয় যাঁরা অর্জন করেছেন এখনও সেই সংগ্রামে রত তাঁদের বংশধরদের তাঁরা সজ্ঞানে সাহায্য করছেন। কিন্তু উপনিষদে যদি পূর্বেকার এই সুরের অভাব থাকে, তাহলে এসব মহৎ-শাস্ত্রের সত্য-সৌন্দর্য-জ্যোতিঃ বা গভীরতা-উচ্চতা যতই অনতিক্রমণীয় হক না কেন, মূর্খ সে যে কোন একখানা পুস্তকের দাস; সুতরাং যখনই তাকে আমরা জ্ঞানের সহায়রূপে ব্যবহার করি তখনই হারান সেই পুরাতন সুর নির্বন্ধসহকারে বার বার স্মরণ করতে হবে, প্রহেলিকার উপেক্ষিত সমস্যার সমাধান অন্যত্র সন্ধান করতে হবে। যে-সব শাস্ত্র এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মের সত্য আমাদের শিক্ষা দেয় কোন অবগুণ্ঠন না রেখে, কার্পণ্য না করে', বহু বিস্তারে এবং মহৎ উদার ভাব নিয়ে; সুতরাং মানবজাতির পক্ষে তার সাহায্য অপরিহার্য। তবে, যেখানে একান্ত সারগর্ভ কিছুর অভাব হয় সেখানে তার

সন্ধানে আমাদের উপনিষদের বাইরে যেতে হবে ; যেমন, উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের উপর যে-জোর দিয়েছে তার সঙ্গে যখন আমরা যোগ করি পরবর্তী যুগের শিক্ষাতে ভাগবত প্রেমকে সানুরাগে যে অনন্য-প্রয়োজনের গৌরব দিয়েছে বা বেদে ভাগবতকর্মকে যে মহৎ মর্যাদা দিয়েছে।

বেদে স্বর্গমর্ত্যে মানবের মধ্যে ভগবানের পরম বিজয়ের বাণী, খৃষ্ট ধর্মে ভগবানের রাজত্বের ও পৃথিবীতে ভাগবতপুরীর বার্তা, পুরাণে ক্রমপ্রগতিশীল অবতারের এবং তার পরিণামে ধর্মরাজ্যস্থাপনের এবং সত্য যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণা, এ সবেরই বাহ্যরূপের পশ্চাতে একটা গভীর সত্য আছে ; উপরন্তু মানুষের ধর্মভাবের পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে। এই ভরসা না থাকলে মানবজীবনের ব্যর্থতার উপদেশ এবং হৃদয়ের তীব্র আবেগ নিয়ে তাকে পরিহার করে' বৈরাগ্য সাধনের শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে পারে শুধু অচিরস্থায়ী বিশেষ যুগে অথবা প্রতিযুগে প্রকৃত-সন্ন্যাস-সমর্থ কতিপয় মাত্র শক্তিমান জীবের পক্ষে। অবশিষ্ট লোকেরা বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হয় প্রত্যাখ্যান করবে, আর না হয় মুখে সে উপদেশ মেনে নিয়ে কাজে তা অগ্রাহ্য করবে, আর না হয়, নিজেদের অক্ষমতার গুরুভারে এবং জীবনকে মায়ার বিভ্রম মাত্র মনে করে' বা বিশ্বকে ভগবানের দ্বারা অভিশপ্ত বোধ করে' অতলে ডুববে—মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম যেমন অজ্ঞানের অন্ধকারে ও জ্ঞানান্বেষণের বিরোধিতায় ডুবেছিল, শেষ যুগে রুদ্ধগতি জাড্যের তামসে এবং উদ্দেশ্যহীন অহংস্ফীত জীবনের ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভারত যেমন ডুবেছিল। ব্যক্তির পক্ষে আশ্বাস ভাল বটে কিন্তু জাতির পক্ষেও আশ্বাস প্রয়োজন। আমাদের পিতা স্বর্গকে মুক্তির আশা নিয়ে উজ্জ্বল থাকতে ত হবেই কিন্তু মাতা পৃথিবীকেও চির অভিশপ্ততার বোধ ত্যাগ করতে হবে।

মানুষের চিত্তে ওপারের বোধ গভীরভাবে অঙ্কিত করবার জন্য এক সময়ে আর সব বর্জন করে' ব্যক্তিগত মুক্তির উপর নির্বন্ধ সহকারে

অত্যধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল, যেমন আবার এক সময়ে লোভ দেখিয়ে ধর্মাচরণ করিয়ে নেবার এবং নিরঙ্কুশ পাশবতা দমন করবার উদ্দেশ্যে পুণ্যশীল ধর্মাত্মাদের জন্য ভোগসুখময় স্বর্গের উপর জোর দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রলোভনের মতই স্বর্গের সব প্রলোভনও জয় করতে হবে। পুণ্যের পুরস্কারে আরামের স্বর্গের প্রলোভন মানুষ ত্যাগ করেছে; ভারতে বহুপূর্বেই উপনিষদ তাকে বর্জন করেছিল আর এখন লোকচিত্তে তার কোন আধিপত্য নাই, মানুষের বিবেক বুদ্ধির কাছে লৌকিক খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মের এইরকমের প্রলোভনের আর কোনও অর্থ নাই। জন্মমৃত্যু থেকে মুক্তি ও বিশ্বপ্রয়াস থেকে অব্যাহতির প্রলোভনও তেমনি প্রত্যাখ্যান করতে হবে—নির্বাণের চেয়ে মৈত্রী ও করুণাকে মহত্তর স্থান দিয়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা যেমন করেছিল। স্বর্গে মর্তে কোন পুরস্কারের দাবী না রেখে যেমন আমাদের পুণ্যানুষ্ঠান করতে হবে, তেমনি মুক্তিও চাইতে হবে আভ্যন্তরীণ ও নির্ব্যক্তিক: চাইতে হবে অহংজ্ঞান থেকে মুক্তি, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন, আমাদের সার্বজনীনত্ব তথা সর্বাতীতত্ব উপলব্ধি; এবং মুক্তির কোন মূল্যই থাকবে না যদি তা মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে ভালবাসা থেকে, যেটুকু পারি জগৎকে সাহায্য করা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আবশ্যক হলে শিক্ষা দিতে হবে যে, একলা নিজের মুক্তিলাভ করার চেয়ে যাতনাক্লিষ্ট আর সব ভাইদের সঙ্গে নরকভোগ করাও ভাল।

সৌভাগ্যক্রমে এতদূর যাবার প্রয়োজন নাই, সত্যের এক দিক স্থাপনের জন্য অন্য দিক অস্বীকার করতে হবে না। সত্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে উপনিষদে যদি কোন একদিকে অত্যধিক জোর দিয়ে থাকে তবে তাথেকে উদ্ধারের পথ তাতেই নির্দিষ্ট হয়েছে। কারণ, পরব্রহ্মকে সর্বাতীত আনন্দরূপে যে জানে ও পায় সে সেই আনন্দেরই একটা

কেন্দ্রে পরিণত হয় আর, তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা সব তার কাছে আসবে—কূপ থেকে কলসী ভরে জল নেবার মত—দিব্য আনন্দে আধার ভরে নেবার জন্য। এই হল, যে-সূত্র আমরা চাই। বিশ্বের সঙ্গে মুক্তজীবের সংযোগ রক্ষা করা হবে একমাত্র যথোচিত কারণে,—যারা এখনও আবদ্ধ তাদের মত ব্যক্তিগত সুখভোগের বাসনায় সে সংস্রব রাখা হবে না, হবে সর্বজীবকে সাহায্য করবার জন্য। তাহলে এই উর্ধ্বাশী আত্মার উদ্দেশ্য হল দুটি :—প্রথম, পরমকে পাওয়া, পরে চিরকাল জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য বতমান থাকা ব্রহ্মেরই মত, তা সে এখানেই হ'ক বা অন্যত্রই হ'ক তাতে মূলতঃ কিছু এসে যায় না ; তবুও সংগ্রাম যেখানে তীব্রতম সেখানেই অধ্যাত্ম-সাধনবীরের থাকা উচিত, আর অবশ্যই অমৃতের সন্তান ও মহত্তম বলে সেই কর্তব্যই নির্বাচন করবে ; পৃথিবীর ডাকই সবচেয়ে বেশী কারণ এইপ্রকারের সিদ্ধপুরুষের, বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম জীবের প্রয়োজন তার পক্ষেই সবচেয়ে বেশী।

এবং, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ যা সাধন করা যেতে পারে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও সেজন্য অপর নিম্নতর উপায়ে সাহায্য বর্জন করা হয়নি। দেবতাদের যে ক্ষুদ্রতর বিজয় ব্রহ্মের পরম বিজয়ের পথ প্রস্তুত করবে তাতে সহায় হওয়া কোন না কোন প্রকারে আমাদের কর্তব্যের অংশ হতেই পারে, হবেও ; কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্য হবে এই :—দিব্যসত্তার আলোক-আনন্দ-মহিমা-শক্তি-জ্ঞানের জীবন্ত মানবকেন্দ্র হওয়া, যাতে তার মধ্য দিয়ে সে দিব্যসত্তা নিজের সংবাদ অপর সব লোককে দিতে পারেন এবং আনন্দের চুম্বকের মত উর্ধ্বতমের দিকে সর্বজীবকে আকর্ষণ করে নিতে পারেন।

শব্দপরিচয়

[অনুবাদে ব্যবহৃত পারিভাষিক বিশেষ শব্দ]

'অবছিন্ন'	বস্তুবিবিক্ত, abstract
'অতিমানস'	মনের উর্ধ্বে ভাগবত জ্ঞান ও ক্রিয়ার তত্ত্ব, supermind
'অবচেতন'	জাগ্রত চেতনার অগোচর মন, subconscient
'অস্বভাবী'	abnormal
'আম্নায়'	আধ্যাত্মিক অনুভবের প্রামাণিক বিবৃতি
'উপাধি'	নামরূপ ইত্যাদি, ব্যাপকত্বের সঙ্কোচসাধক পরিচায়ক ধর্ম
'তন্মাত্র'	সূক্ষ্ম অমিশ্র শব্দস্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়বোধ
'তেজ'	ক্রিয়াশক্তির স্ফুরণ,
'তৈজস'	তেজঃ সম্বন্ধীয়। -সত্তা', তেজের আধার, স্নায়বিক সত্তা
'তূর্যাতীত'	পরম অজ্ঞেয় ['তূর্য', বিশ্বাতীত মহেশ্বর, তাঁরও ওপারে]
'পরাক্'	বহিরাবৃত্ত, objective
'প্রকল্প'	সিদ্ধান্তের প্রাথমিক কল্পনা, hypothesis
'প্রতিবোধ'	(১) বোধিজাত অনুভব; (২) বিশিষ্ট জ্ঞান apprehension
'প্রতিভাস'	আপাতপ্রতীয়মান ব্যাপার, phenomenon
'প্রত্যক্'	অন্তরাবৃত্ত, subjective
'প্রত্যয়'	ধারণা, ভাবনা, conception
'প্রৈতি'	কার্য্যকারিণী শক্তি, প্রগতির প্রবেগ, kinetic energy
'বিভাব'	এক তত্ত্বের বিভিন্ন দিক, aspect
'বোধি'	সহজ জ্ঞান intuition

শব্দপরিচয়

'ব্যতিরেক' বিরোধ বিচার ন্যায় ('অন্বয়'-এর বিপরীত)

'সংবেদন' স্পর্শজনিত সাক্ষাৎ বোধ, sensation

'সংবেশন' hypnosis

'সংবোধ' পরমের তন্মাত্র বোধ, সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতের সর্বেন্দ্রিয়গুণ অনুভব, Sense

'সংবোধি' স্বতঃস্ফূর্ত সম্যক বিজ্ঞান, spiritual intuition

'সংস্থিতি' বিশেষ বিন্যাস, অবয়ব সজ্জার বৈশিষ্ট্য, organisation, structure ; বিশেষ অবস্থা status

'সহজাত সংস্কার'—instinct

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
২	১	ধামান	ধীমান
১৯	২	ভিতরণ	বিতরণ
২১	১	শু ু	শুধু
৩৭	৩	ছন্দের,	ছন্দের
৫৬	১৭	সমীকর ে র	সমীকরণের
৫৭	৬	ক্রিয়াবাত্ত	ক্রিয়াবৃত্তি
৬০	১২	স্বতঃস্ফর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
৬২	১১	গোণবৃত্তি	গৌণবৃত্তি
৭৪	৫	দশন-শ্রবণ	দর্শন-শ্রবণ
৮৮	২৪	অকৃতাথ	অকৃতার্থ
৯৩	৪	অমরা	আমরা
৯৪	৫	দেবতারা চান	দেবতারা
৯৫	১	বহ্ম	ব্রহ্ম
৯৬	১৪	নিয়ে তাদের,	নিয়ে, তাদের
১০০	৩	হল	হলেন
১০৩	১৭	মহাভত	মহাভূত
১০৪	৮	পারেন।	পারেন,
১২৩	১৪	নির্ব্যক্তিক	নৈর্ব্যক্তিক
১২৪	৮	বতমান	বর্তমান